শিশু-চারণা

[Childlore]

নির্মলেন্দু ভৌমিক

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১ আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রকাশক
সাধারণ সম্পাদক
লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ,
৬০ জেমস লঙ সরণী, কলকাতা - ৭০০ ০৩৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শ্রীসনৎকুমার মিত্র

মুদ্রক :
গুপ্ত প্রেশ
বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ড. শ্রীসনৎকুমার মিত্র

মিত্রবরেষু

মুখবন্ধ

'লোকসংস্কৃতি গবেষণা গ্রন্থমালা' বাঙলা লোকসংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা আনতে পেরেছে বলে আমরা মনে করি। এতে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। একটি বিষয় নিয়ে একটি বই। কোন কোন সময়ে এমনও হবে যে একটি বড় বিষয়কে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন উপ-শিরোনামে একাধিক বই তৈরি হতে পারে। ফোকলোর তত্ত্বের দিক, বিভিন্ন উপাদান, ফোক পারফরমিং আর্টের বিচিত্র প্রজাতি, লোক-সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব এবং লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ, শীলিত সংস্কৃতি ও আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে ফোকলোরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি সমস্যা অবলম্বন করে আমাদের এই গ্রন্থমালা। বইগুলি সংক্ষিপ্ত, তবে প্রসঙ্গটিকে পূর্ণ ও সংহতভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একদিকে বিষয়টির বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় দেওয়া যেমন উদ্দেশ্য, তেমনি সেই পরিচয় সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ ফলের উপর নির্ভরশীল। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু বিষয়টির পরিচয় দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করা এবং তার জন্য আমরা সর্বদা এমন লেখকের সন্ধানে থাকব যাঁর বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আছে। এই তিনটি সূত্রে আমাদের পুস্তক-গুলিকে মৌলিক রচনা করে তোলবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

আমাদের লক্ষ্য যে সব বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়নি, সে-সব ক্ষেত্রে পথিকৃত হওয়া। যে-সব বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে সেখানে আধুনিক ভাবনার সংযোগ ঘটানোর চেষ্টা করা। যে-সব বিষয় আলোচনার যোগ্য বলে আগে বিবেচিত হয়নি, তাদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

তাই আমরা কখনও একজন লেখকের বই প্রকাশ করব। কখনও একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী একাধিক লেখকের গ্রন্থের প্রকাশ করব। আমরা দামি পুরনো লেখা সংকলনে সর্বদা আগ্রহী, সুযোগ পেলে এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করে পুরনো বইয়েরও পুনর্মুদ্রণ করব।

আমাদের পরিষদ অনেকদিন ধরে লোকসংস্কৃতি-চর্চায় নিবিষ্ট এবং ষোল বছর ধরে একটি বাঙলা গবেষণা ত্রৈমাসিক বের করছে নিয়মিত, একটি সংখ্যা

একবারও না থেমে। বছরে দু-বার একটি ইংরেজি গবেষণা পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে।

লোকসংস্কৃতির প্রতি যাঁদেব প্রীতি, তাঁরা যদি আমাদের এই প্রচেষ্টাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, যাঁরা লোকসংস্কৃতি-বিষয়ের ছাত্র তাঁরা এই গ্রন্থমালা দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হন, তাহলেই আমরা কৃতার্থ বোধ করব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক এবং বাঙলা-ইংরাজি পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক ড. সনৎকুমার মিত্র সাধারণভাবে এই গ্রন্থমালা সম্পদনার দায়িত্বে আছেন; বিশেষক্ষেত্রে আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকি। কখনও কোন বিশেষ প্রকল্পে অতিথি সম্পাদকও আমন্ত্রিত হতে পারেন, যেমন এবারে আমন্ত্রিত হয়েছেন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ অধ্যাপক ড. শ্রীনির্মলেন্দু ভৌমিক।

উপোদ্‌ঘাত

এই গ্রন্থের পরিকল্পনা থেকে প্রকাশনা পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটিই ড. শ্রীসনৎকুমার মিত্র দ্বারা কৃত। শেষের দিকে অধৈর্য হয়ে তিনি আমাকে তিরস্কার পর্যন্ত করেছেন—যা না হলে আজও এই বই বের হত না। এই তিরস্কারের জন্য তাঁকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

আমার দুই গবেষক ছাত্র —ড. শ্যামপদ মণ্ডল এবং শ্রীশ্যামল বেরা একাজে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন। শ্যামপদ নদীয়া জেলা এবং শ্যামল মেদিনীপুরের লোকজীবন ও লোকসাহিত্য নিয়ে বই লিখেছেন। এঁদের ক্ষেত্রকর্মের [Field Work] পরিসরও ব্যাপক। এঁদের সহযোগিতার কথা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি।। শ্যামপদ ও শ্যামলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাই।

বাঙলা লোকভাবনার পথিকৃৎ আমার মতে শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয়। ইনি ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন, তথাপি ইনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মুম্বাই এবং বাঙ্গালোরের নৃতত্ত্ব বিষয়ক ইংরেজি সাময়িক পত্রে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ বের হয়েছিল। সেই প্রবন্ধগুলির কিছু কিছু পড়ে আমি নিজে উপকৃত হয়েছি। বিভিন্ন প্রকার lore-এর কথা তিনিই প্রথম বলেন। এই বই প্রকাশের ক্ষণে আমি তাঁর উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করি।

এই বই পড়ে কারো কিছুমাত্র ভালো লাগলে নিজের শ্রম সার্থক বলে মনে করব। কারো কোনো নতুন তথ্য দেবার থাকলে অনুগ্রহ করে জানাবেন। ইতি—

১.

'Folklore'-এর 'লোক' [Folk] বলতে পূর্ণ বয়স্ক মানুষ। কিন্তু শিশুর বা অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরও আছে তা একটি পৃথক জগৎ, সংস্কার, মনস্তত্ত্ব। সেই কথা মনে রেখেই, প্রবন্ধের বিষয় এই স্থির করেছি—Childlore বা **'শিশু-চারণা'**। আমার মতে, 'লোকচারণা'র মতো 'শিশুচারণা'ও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় হতে পারে। সেই বিশ্বাসেই এই নিবন্ধ লিখতে উৎসাহী হয়েছি।

শিশুর মধ্যেও নর-নারীর বিভেদ আছে। শিশুর প্রতি-পালকগণের জীবন-মনস্তত্ত্ব সে জন্যে পৃথক। পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সমাজনীতি ও অর্থনীতি, জীবনচর্যা ও সংস্কার অনুসারে প্রতি-পালকগণের মনস্তত্ত্বও ভিন্ন হয়ে যায়। যে সমাজে বর-পণ প্রথা প্রচলিত, কন্যা সেখানে পিতা-মাতার ক্ষেত্রে এক দায়। সেখানে ছড়া শোনা যায় :

মেয়ে ছেলে কাদার ঢেলা।
ধপাস করে মাটিতে ফেলা।।

কিন্তু যেখানে কন্যা-পণ প্রথা প্রচলিত, সেখানে কনের এই করুণ অবস্থা নয়। অথর্ববেদে [৬.১১.৩] কন্যার জন্ম নিন্দিত, কিন্তু পুত্রের জন্ম আনন্দের [১.১১.৬। ৩.২৩.২] ঘটনা বলে উল্লিখিত। ভ্রাতৃহীনা কন্যাবিবাহ নিন্দিত ছিল, খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে আজও এর জের চলছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে বরই কনের বাড়িতে অবস্থান করে। শ্যালক-জামাই একই বাড়িতে একই হাঁড়িতে খায়। ছড়া লিখছে :

'ভাত খেয়ে যাও জামাই-শালা।'

এখানে যে জামাই, সেই শালা,—এটি কর্মধারয় সমাস নয়, দ্বন্দ্ব সমাস : জামাই এবং শালা। রূপকথার পরিণতিতে শোনা যায় : রাজপুত্র অনেক দুঃসাহসিক কাজ করে রাজকন্যাকে পেল। কিন্তু সে আর নিজ-দেশে ফিরল না। অর্ধেক রাজত্ব-সহ রাজকন্যাকে নিয়ে বসবাস করতে থাকল। একেবারে

মাতৃতান্ত্রিক সমাজের কথা, কিংবা ঘর-জামাই রাখার প্রথার অবশেষ।

অর্থনৈতিক দিক থেকেই পুরুষ ও কন্যাসন্তানের পার্থক্য আছে। উচ্চকোটির অভিজাত পুরুষ শিশুর ভবিষ্যৎ কল্পিত হয় এই ভাবে : সে বণিক, বাণিজ্যে যাবে : 'খোকা যাবে নায়ে...' আর নিম্নকোটির পুরুষ শিশু জেলে হয়ে মাছ ধরতে বা হাল চষতে যায়। কিন্তু কন্যা শিশুর কর্মজীবনের কোন ভবিষ্যৎ ছবি নেই। সেখানে আছে তার বিবাহিত জীবনের নানা অনুষঙ্গ।

অর্থাৎ, লিঙ্গগত এই পার্থক্যের বোধ শিশু-চারণার একটি ভিত্তি স্থানীয় দিক।।

২.

মায়ের গর্ভাবস্থা থেকে শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত— লোকজীবনে নানা সংস্কার বিশ্বাস প্রচলিত আছে; লোকগোষ্ঠীর ভিন্নতা অনুসারে তাতে বৈচিত্র্যও আছে।

মধ্যযুগের সাহিত্যে 'সাধভক্ষণে'র [পঞ্চামৃত ভক্ষণ, কাঁচা সাধ, পাকা সাধ]-মতো ছিল 'গর্ভবন্দনা' ও 'গর্ভপত্রে'র প্রচলন। প্রোষিতভর্তৃকাকে স্বামী তার আসন্ন সন্তানকে বৈধ বলে লিখিত ভাবে স্বীকার করে যেত। একেই বলা হত 'গর্ভপত্র'। স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান জন্মালে ইংরেজিতে Posthumous child, কথাটি থাকলেও, বাঙলায় এর কোনো প্রতিশব্দ নেই। কুমারীর অবৈধ সন্তান 'কানীন', love child, virgin-born। কিন্তু যিশু খ্রীষ্ট কুমারী মেরীর সন্তান হলেও তিনি The virgin birth। মেরীকে বলা হয়, The blessed virgin birth। যুদ্ধের সময় নানা প্রকার অবৈধ সংযোগে যে সন্তানের জন্ম হয়, তাকে বলে war baby [রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' এই নামকরণের মধ্যে গোরা-সৈন্যের আভাস আছে কি?]।

নারীর ভাষায় গর্ভবতী রমণী হলো 'পোয়াতী' [পুত্রবতী]। গর্ভবতীকে নানা বিশ্বাস-সংস্কার মেনে চলতে হয়। সাধারণ বিশ্বাসে—'মেয়ের মা সুন্দরী'।

অর্থাৎ গর্ভবতী যদি গর্ভকালে সুন্দরী হতে থাকে, তবে তার কন্যা সন্তান হবে। এই বিশ্বাসে অনেকে গর্ভবতীকে উপযুক্ত প্রোটিন-ভিটামিন খেতে দেয় না। বেশি ডিম খেলে সন্তানের মাথা বড়ো হয়। গ্রহণের সময় গর্ভবতী উপযুক্ত নিয়মাদি পালন না করলে সন্তান 'গন্নাকাটা' [< গ্রহণ + আ], hare-lipped, হয়। জোড়া ফল খেলে যমজ সন্তান হবে। ক্বচিৎ যমজসন্তান যুক্ত থাকে, তাকে বলে Conjoined twins, [সম্প্রতি ইরানে এ-ঘটনা ঘটেছে]। গর্ভের অষ্টম মাসে জাত শিশুকে বলা হয় 'আটাসে' [< আটমাসিয়া]; এই শিশু দুর্বল ও ভীরু হয় বলে বিশ্বাস। গর্ভাবস্থায় শিশুর চোখ বন্ধ থাকে, অনেকে গর্ভস্থ শিশুকে 'কানা' বলে।

প্রসূতিদের ধনুষ্টংকার ইত্যাদি রোগ হয়ে থাকে। সাধারণ বিশ্বাস— এগুলো কোনো অপদেবতার অপকর্ম। এই জন্যে 'আঁতুড় ঘর' নির্মাণে বা প্রসূতির সেই ঘরে প্রবেশকালে নানা সংস্কার মেনে চলতে হয়। সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরে'র একটি 'কথা'য় আছে, প্রাচীন ভারতে সূতিকাগৃহের জানালা অর্ক ও শমী গাছ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত, অপদেবতাদের দূরে রাখবার জন্য। নানা প্রকার অস্ত্র ঝুলিয়ে দেওয়া হত। আঁতুড় ঘরের চারদিকে কাঁটা গাছ এখনো দেওয়া হয়। দরজার দুপাশে অপদেবতাকে তুষ্ট করবার জন্য দেওয়া হয়—পান-সুপুরি ও চাল। প্রসবের বিলম্ব হলে প্রসূতির মুখে তারই চুল গুঁজে দেওয়া হয়। জরায়ুর খোলস বের হওয়াকে বলে 'ফুল পড়া'। সুপ্রসবের জন্য রঙপুর জেলাতে একদা গাওয়া হত 'বারমাসী গান'। এই গানকে বলা হত 'কৈন্যা বারমাসী গান'।[১] বারমাসী গান এখানে বিপত্তারক। কোথাও বা ওঝার আশ্রয় নেওয়া হয়। প্রাচীন ভারতে ওঝার বিদ্যাকে বলা হত 'বৈনায়কী বিদ্যা'। মেদিনীপুরের গ্রাম্য রমণীরা প্রসব হয়ে যাওয়াকে বলে—'মা-ছা' আলাদা' হওয়া। অনেক সন্তানের মধ্যে শেষ সন্তানকে নারীর ভাষায় বলে—'মায়ের পেট-মোছা ছেলে'। যে নারী জীবনে একবার মাত্র

---

১. পরিশিষ্টে এমন একটি গান দেওয়া হল।

সন্তান ধারণ করে, সংস্কৃতে তাকে বসে 'কাকগর্ভা'। কারণ কাকও একবার মাত্র গর্ভবতী হয়। এইরূপ কাককে 'সকৃৎগর্ভা' বলা হয়। একাধিক বার মৃতসন্তান প্রসব করলে সেই মৃতবৎসা জননীকে বলা হয় 'মড়ুঞ্চে পেয়াতী' [< মড়ান + চিয়া]। পূর্ববঙ্গে শোনা যায় 'মইল্লাতি ধরা' [< মরণ + আল + তি]। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী রমণীরা দণ্ডায়মান অবস্থাতেই প্রসব করত, বয়স্করা কুলোতে করে নবজাতককে ধারণ করত। এখন এ প্রথা বিলুপ্ত।

গ্রামাঞ্চলের অনেক প্রসূতি নিজেই নাড়ি [Navel string] কাটে। নয়তো ধাই, দাই [< ধাত্রী] তা কাটে। সাধারণত বাঁশের চেঁচাড়ি [চর্যাপদে 'চঞ্চাড়ি' শব্দ মিলেছে] দিয়ে নাড়ি কাটা হয়। এই 'ধাই' কে রাজবংশী সমাজে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে বলা হয় 'নাড়ী-কাটা মাও'। ধাত্রী বা দাই স্বতই স্ত্রীলিঙ্গ বাচক, তথাপি সেখানে স্ত্রীপ্রত্যয়যুক্ত করে বলা হয় 'ধাইআনী', 'দাইয়ানী [< ধাই - আনী।] প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপের শীষের আগুন বুড়ো আঙুলে নিয়ে কাটা নাড়িতে সেঁক দেওয়া হয়। নাড়ি কাটার দোষে নাভিস্থল উঁচু হয়ে থাকে, এ এক ধরনের শিশু-হার্নিয়া [Hernia], শিশু হাঁটতে শিখলে ক্রমে তা সেরে যায়। ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের বিচারে 'নিম্ন নাভি' বিশেষ কাম্য, কালিদাসের রচনায় তার প্রমাণ আছে। যে সব কমলালেবুর ওপরে নাভির মতো গর্ত থাকে , সে সব কমলালেবুকে এই জন্য [Navel orange] বলে। কোনো কোনো অভিজ্ঞ ধাই নাড়ির 'গিঁট' দেখে বলে দিতে পারে, ভবিষ্যতে প্রসূতির আর ক-টি ছেলে-মেয়ে হবে।

কন্যা-সন্তান চিরদিনই অবাঞ্ছিত। তাই জন্ম মাত্রেই কন্যাকে হত্যা করে ফেলা হত। অনেক রাজপরিবারে এ নিয়ম ছিল। প্রাচীন গ্রীসে সদ্য জন্মানো কন্যাকে উন্মুক্ত প্রান্তরে ফেলে দেওয়া হত। কন্যা হত্যার কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি ছিল। ঐতিহাসিক হরিহর শেঠ লিখেছেন : বড়ো পাত্রে দুধ নিয়ে সেই দুধে ডুবিয়ে কন্যাকে হত্যা করা হত। নুনজল খাওয়াবার কথাও শোনা যায় ['নুন খাইয়ে মেরে ফেলা'—প্রবাদ]। অর্থাভাবগ্রস্ত পিতা-মাতা নিতান্ত সামান্য মূল্যে কন্যা বিক্রয় করে দেয়।কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে সংবাদ

পাওয়া গেছে, উত্তর চব্বিশ পরগণার জনৈক কন্যার পিতা তার সদ্যোজাত কন্যাকে গলা টিপে হত্যা করে এই বিশ্বাসে যে এই ভাবে সে যে শক্তি অর্জন করবে, তারই ফলে সে পুত্র সন্তানের পিতা হতে পারবে। কিন্তু গরীবদের কাছে পুত্র সন্তানের বদলে কন্যা সন্তান নিতান্তই কাম্য। সেখানেই বরং উল্টোটাই ঘটে। হত্যাকর্মে ধাত্রীদের ভূমিকাই প্রধান।

নানা কারণে আঁতুড় ঘরেই অনেক শিশুর মৃত্যু ঘটে। সাধারণ মানুষ এর পেছনে কোন বিশেষ অপদেবতার রোষদৃষ্টির কথা বলে। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এক অপদেবীর উল্লেখ করেছেন—জাতাপহারিণী। ইনি জলবাসিনী। সন্তানের অকাল মৃত্যু যাতে না ঘটে, সেই কারণে এঁকে পূজা করা হয়। তুলনীয় খ্রিস্টানদের একটি উৎসব—'Childermas', ২৮ শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। Herod শিশুদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে; তারই স্মরণে এই অনুষ্ঠান।

মৃতবৎসা জননী সন্তানের আয়ুষ্কামনায় সাধারণত ধাত্রীদের কাছে সন্তান বেচে দেয়, এবং ফিরে কিনে নেয়। এতে সন্তান আর নিজের রইল না এবং নিজের যদি কোনো দোষ থাকে তবে তাও এতে খণ্ডে যাবে। ক্ষুদের বিনিময়ে 'ক্ষুদিরাম', 'বেচারাম', 'কেনারাম'— প্রভৃতি নাম এই প্রথার প্রত্যক্ষ ফল; আবার কড়ির বিনিময়ে [অবশ্যই বিজোড় হবে] কিনলে এককড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি। লক্ষণীয়, সব কটি কড়িকেই বেজোড় হতে হবে। বেজোড় সংখ্যার ওপর এখানে জাদুবোধ আরোপিত হয়ে থাকে। বেচাকেনার অভিনয় ছাড়াও সন্তানের ঘৃণ্য নিন্দাজনক নাম দেওয়া হয়, যাতে 'যমের অরুচি' ঘটে। খেঁদী, বুঁচী, পচা [কিন্তু পাঁচু নয়] প্রভৃতি। এমন কি সন্তানের দেহে খুঁত করে দেওয়া হয়। অনেকগুলির পর আর মেয়ে সন্তান না চেয়ে নাম করা হয় : চায়না, আন্না [< আর না] থাকো, থাকো মণি। কিংবা বলা হয়, 'ইতি', 'ইতিমা'। পূজার অভিনয় : প্রণতি, অঞ্জলি, আরতি, ইত্যাদি। এগুলি নামকরণের প্রসারণ। যমজ ছেলের নামে রামায়ণের প্রভাব : 'লব-কুশ, যমজ কন্যার বেলায় নদীর নাম—'গঙ্গা-যমুনা' লক্ষণীয়। প্রাচীন ভারতে কিন্তু নদীর নামে কন্যার নাম রাখা কাম্য ছিল না। যমজ সন্তনের নামকরণে প্রায়ই যুগ্মকতা ও ছন্দ

ক্রিয়াশীল। কখনো জন্মের পর্যায় অনুসারে নাম হয়—ছোটু-বড়ু [ছোটো-বড়ো] 'ছুট্‌কী-বড়্‌কী'ও শোনা যায়। [< ছোটো + কিয়া, বড়ো + কিয়া]। মেদিনীপুর থেকে পেয়েছি 'ছটাকি'। পূর্ববঙ্গে 'মাইজান' [< মধ্য + আন, আনী] পশ্চিমবঙ্গে ' মেজেন'। বহু সন্তানের পর শেষ সন্তানের নামও ছোটু' [< ছোটো + উ, আদরার্থে]। এ-ছাড়া— 'ছোটকু', স্ত্রীলিঙ্গে 'ছুট্‌কী' 'ছোটাকী'। মুসলমান সমাজে প্রথম সন্তানের নাম—'বরকত্' [হিন্দু সমাজে যেমন 'এক' না বলে 'রাম' বলা হয়, মুসলমান সমাজে তেমনি 'বরকত']।

শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই স্ত্রীলোকেরা উলুধ্বনি করে তাকে অভিনন্দন জানায়। কন্যা হলে পাঁচবার, পুত্র হলে সাতবার। মুসলমান সমাজে আজান দেবার প্রথা আছে,—অন্তত উত্তর চব্বিশ পরগণায় এবং অবশ্যই পুত্র হলে। পূর্ববঙ্গের রমণীরা সমবেত ভাবে অতি উচ্চকণ্ঠে উলু দিয়ে থাকেন। উলুর গণনাকে বলা হয় 'ঝাঁক' : পাঁচ ঝাঁক, সাত ঝাঁক। ঝাঁক শব্দের মধ্যে বহু বচনের প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।।

৩.

কি পুরুষ, কি নারী,—সন্তান না হওয়া সামাজিক দিক থেকে নিন্দনীয়। তাদের মুখদর্শন অমঙ্গলের। পুরুষকে বলা হয় আঁটকুড়, আঁটকুড়া, আঁটকুড়ো। [< ওড়িয়া আষ্টুকুড়া], লৌকিক ভাষায় আঁটকুড়া-হাপুতা লোক। দেবর্ষি নারদ আঁটকুড়া ছিলেন, দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে বৃন্দাবনে নন্দের আঁটকুড়ো নাম ঘোচে। নিঃসন্তান নারীকে বলা হয় বাঁজা [< বন্ধ্যা], উত্তরবঙ্গে বলা হয় 'বাঞ্জী' ['বন্ধ্যা' শব্দজাত 'বাঞ্জী'ই স্ত্রী লিঙ্গবাচক। এর উত্তরে স্ত্রী প্রত্যয় করে 'বাঞ্জী' করা হয়েছে। 'বাঞ্জা' বলতে উক্ত অঞ্চলে নিঃসন্তান পুরুষকে বোঝায়। 'বাঞ্জী ন্যাড়ের ব্যাটা'। সেখানে একটি গালি বিশেষ।]

সন্তানের জন্ম উপলক্ষে যে আনন্দোৎসব, তার সঙ্গে নন্দোৎসব [ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ পক্ষের জন্মাষ্টমীর পর দিন] তুলনীয়। নন্দের পুত্রলাভের

আনন্দ এতে ব্যক্ত হয়েছে। এক সময়ে নন্দোৎসবের গান ছিল :

শিব নাচে, ব্রহ্মা নাচে, আর নাচে ইন্দ্র।
গোকূলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ॥
—'ভারতী' / মাঘ, ১৩২৯।

এই ছড়ার পরবর্তী অংশ 'ছেলেভুলানো ছড়া-২-তে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন [সং ৩৭] :

ক্ষীর খির্‌সে ক্ষীরের নাড়ু মর্তমানের কলা।
নুটিয়ে নুটিয়ে খায় যত গোপের বালা॥
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা এল ধেয়ে।
তাদের হাতে নড়ি, কাঁধে ভাঁড়—
নাচে থেয়ে থেয়ে॥

আঁটকুড়োর বাড়িতে 'কার্তিক ফেলা'র প্রথা আছে। এ-প্রথা একেবারেই পশ্চিমবঙ্গের। এতে আছে কৌতূকবোধ, বা সামাজিক নিন্দার দিক। পূর্ববঙ্গে কার্তিক মূলত কৃষিদেবতা, পশ্চিমবঙ্গে কার্তিক কুমার। [পৌরাণিক বিশ্বাসে কার্তিক দেবসেনাপতি; কখনো বা 'কামদেবতা'] কার্তিককে বলা হয়— 'যান্মাতুর', অর্থাৎ কৃত্তিকাদি ছয় মাতার পুত্র। কার্তিকের আরাধনা করলে পুত্র লাভ হয়। এই জন্য কৌতূক করে পাড়ার লোকেরা রাতের অন্ধকারে নিঃসন্তান গৃহস্থের বাড়ির দোরগোড়ায় কার্তিক ফেলে রেখে যায়। গৃহস্থ তখন ওই কার্তিকের আরাধনা করতে বাধ্য হন।

কন্যা সন্তানের প্রতি প্রাচীন ভারতে নানা বিরূপ মন্তব্য করা হলেও স্মৃতিশাস্ত্রে কন্যার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পিতা-মাতার মৃত্যুর চতুর্থ দিবসে, কন্যাই পিণ্ডদান করে। কন্যার পিণ্ড না পেলে পিতা-মাতা প্রেতলোক থেকে উর্ধ্বলোকে যেতে বাধা পায়। পুত্র না থাকলে যেমন 'ছেলে-আঁটকুড়ো' বলে, মেয়ে না থাকলেও তেমনি 'মেয়ে-আঁটকুড়ো' বলে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কথাও এখানে ওঠে। ভ্রূণহত্যা এক কালে মহাপাপ বলে

বিবেচিত হত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ এক কারণ। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'বলিদান' ও 'শাস্তি কি শাস্তি' নাটকে ভ্রূণহত্যার প্রসঙ্গটি তুলেছেন।

অনেক অপুত্রক অপরের পুত্রকে 'দত্তক' বা 'দত্তকপুত্র' [< দত্রিম], গ্রহণ করেন। মনুসংহিতায় উল্লিখিত [৯.১৫৯] দ্বাদশ প্রকার পুত্রের অন্যতম। দত্তকপুত্র স্বীকৃত পিতা-মাতার মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধাদি এবং সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাকে পুত্রবৎ অশৌচাদি পালন করতে হয়। প্রকৃত পিতার পদবী ত্যাগ করে গৃহীত পিতার পদবী নিতে হয়। এ-হল যথাবিহিত গৃহীত পোষ্যপুত্র, লৌকিক বাঙলায় পোষ্যপুত্র পুষ্যিপুত্র রূপে উচ্চারিত হয়। আবার সাধারণ অর্থেও পোষ্যপুত্র নেবার দৃষ্টান্ত মেলে। ইংরাজিতে Foster-father, Foster-mother, Foster-child পালিত সন্তান। Foster-brother একই পালক কর্তৃকপালিত ভিন্ন পিতামাতার সন্তান। খ্রিস্টান ধর্মমতানুসারে, খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা কালে যিনি ধর্মপিতৃত্ব বা ধর্মমাতৃত্ব স্বীকার করেন, তিনি god father, god mother; ধর্মপুত্র, god child; ধর্মকন্যা, god doughter। দুই রমণী সই পাতালে তাদের পুত্রকন্যা তাদের 'সইমা' বলে ডাকে। এই রমণীদের একজন অপুত্রক হলে অপরজনের পুত্র সইমা-র মৃত্যুতে অন্তত তিনরাত অশৌচ পালন করে এবং চতুর্থীর দিন পিণ্ডদান করে। উত্তর-বঙ্গের রাজবংশীদের বিবাহকালে পিতৃহীন বরের পিতারূপে, বরের মাথায় যে আশীর্বাদী জল ঢালে, তাকে 'পানি ছিটা বাপ' বলে।।

৪.

শিশুর জন্মের পর তার জীবনের প্রথমতম অনুষ্ঠান হয়— ছয় দিনের রাতে। অনেক আদিবাসী সমাজে, শিশুর জন্মের পর, নানা সংস্কার-বিশ্বাসাদি পালনের প্রথা আছে। শিশুর জন্মের ষষ্ঠরাত্রির অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন— ষষ্ঠীদেবী। এই অনুষ্ঠানকে তাই লৌকিক ভাষায় বলা হয় 'ষেটেরা', ষষ্ঠীর অনুগ্রহেই সন্তানের জন্ম, তাই শিশুর অবস্থান 'ষেটের কোলে'। শিশুর বিপদ-আপদ-অমঙ্গল দূর করতে তাই বলা হয় 'ষাট, ষাট' বা 'বালাই [< আরবী

'বলা' = অমঙ্গল] ষাট'। 'ষষ্ঠী বাটা' [< ব্রত]। ষষ্ঠী - আনী = ষাটীয়ানী, পূর্ববঙ্গে অপিনিহিতি জাত রূপ, 'ষাইট', 'ষাইটানী'। উত্তরবঙ্গে ষষ্ঠী + ইকার = ষাটীয়ার, ষাইটোর [অনেকে ভুল বানানে লেখেন—'সাইটোর']।-র-ল- এবং -ন-হয়ে হয় 'ষাইটোল', 'ষাইটোন'। বীরভূমে বলা হয়—'ষাটুর বাও [বাতাস] পাও'। শিশুর জন্মের ষষ্ঠ রাত্রিতে নিখিল বঙ্গে রমণীগণ সমবেত ভাবে গান গেয়ে, 'কথা' বলে রাত্রি জাগরণ করে, এমন কি, কোথাও কোথাও মুসলমানগণও। গিরীন্দ্রমোহন মৈত্র 'মহিলাব্রত' [রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ১৩১৫, ১ম সংখ্যা], নামে একটি প্রবন্ধে জানাচ্ছেন : 'সূতিকাগৃহে 'সাটোর' বা সূতিকা ষষ্ঠীর দিন যে ষষ্ঠীপূজা হইয়া থাকে পুত্রবতীগণ সেই দিন হইতেই এই ব্রত [ষষ্ঠীব্রত] আরম্ভ করিয়া থাকেন।' চট্টগ্রামে বলা হয় 'হাইট < ষাইট খেলা'। সমবেতভাবে রমণীগণের কোনো অনুষ্ঠানে গান গাওয়াকে সেখানে বলে 'হাহলা গীত' [< সখীওয়ালা]। পূর্ববঙ্গেই মেলে 'হাইট্যারা' < ষাইটোরিয়া < ষষ্ঠী + ইকার + ইয়া।

এই দিন দেবী ষষ্ঠীর এবং ভাগ্যদেবীর উদ্দেশে ফল-নৈবেদ্যাদি নিবেদিত হয়। নৈবেদ্যের মধ্যে খই-মুড়কী-কাঁঠালী কলা-বাতাসা থাকবে। একটি থালায় কাগজ-কলম-ধান-মাটি [এঁটেল মাটি], কড়ি প্রভৃতি রাখা হয়। কাগজ-কলম শিশুর ভাগ্যলিপি লিখবার জন্য। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ তাঁর 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে লিখেছেন, ভাগ্যদেবী যে লিখন সেদিন লিখে যান, কপালে ঝামা দিয়ে ঘষলেও তা উঠবে না। একটি বাঙলাদেশী 'আলকাপ' নাটকেও এই অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গটি আছে। পরদিন সকালে যে বস্তুটি একটু এলোমেলো থাকবে, ধরে নেওয়া হয়, সেটাই শিশুর ভবিষ্যতের জীবিকা হবে। এদিন ষষ্ঠী ও ভাগ্যদেবীর আগমনের জন্য ঘরের দরজা খোলা রাখা হয়। বাইরে অন্যান্য রমণীগণ সমবেত ভাবে নৃত্য-গীত-কথা-কথনে রত থাকে।[১] কোনো

---

১. মেদিনীপুর জেলার অংশ বিশেষে এই দিন যে কথকতাময় নাট্যানুষ্ঠান হয়, পরিশিষ্টে তার নিদর্শন দেওয়া হলো।

কোনো অঞ্চলে এই দিন শিশুর হাতে-পায়ে লোহার বালা পরিয়ে দেওয়া হয়,—লোহা রোগ-ব্যাধি-অমঙ্গলাদি প্রতিরোধ করবে, এই আশায়। কন্যা সন্তানের কান বিঁধিয়ে দেওয়া হয়।

ছয় দিনের পর অষ্টম দিনের সন্ধ্যায় হয় 'আটকড়াইয়া', 'আটকড়াইয়ে' অর্থাৎ আটরকমের কলাই খাওয়া। সমবেত বালক-বালিকাদের হাতে বা কোঁচড়ে তা দেওয়া হয়। মনে হয়, এটাই শিশুর Vicarious শস্যভক্ষণ। শিশুর হয়ে বালক-বালিকাগণ খায়। অথবা, এই কড়াইয়ের মধ্যে কোনো ভেষজগুণ আছে, যা শিশুর রক্ষক ও বর্ধক। আট কড়াই খাবার সময় বর্ধমান অঞ্চলে যে ছড়াটি বলা হয়, ড. সুকুমার সেন সেটি সঙ্কলিত করেছেন।

শিশুর জন্মে পর জননী এবং পরিবার একমাস, অশৌচ পালন করে। এই অশৌচকে বলে 'আনন্দাশৌচ' বা 'জাত্যাশৌচ' বা 'শুভাশৌচ'। সেদিন ঘর-দোর পরিষ্কার করতে হয়, প্রসূতিকে 'নাপিত ছুঁতে' হয়। 'নাপিত ছোঁয়া' একটি পারিভাষিক শব্দ। নাপিতের কাছে ক্ষৌরকর্ম [পূর্ববঙ্গে ক্ষৌরী > খেউরী। 'খেউরী হওয়া'] করাকে বলা হয়—নাপিত ছোঁয়া। [মুসলমানগণও এ-রীতি পালন করে]। এই দিন যে ষষ্ঠী পূজা করা হয় তাতে পাখা [পাখার বাতাস শিশুর অমঙ্গল দূর করবে] ও শিল-নোড়ার প্রয়োজন হয় [শিশু শিল-নোড়ার মতো দৃঢ় হবে। এই কারণে বিয়ের অনুষ্ঠানেও শিলের প্রয়োজন হয়]॥

৫.

সংস্কৃতে প্রবাদ আছে,—শিশুর রোদনই বল। এই কান্না দিয়েই সে তার সর্ব প্রকার অভাব-অসুবিধে বুঝিয়ে দেয়। শিশু-মনস্তাত্ত্বিকেরা বলে থাকেন, একুশ দিন বয়স হয়ে গেলেই শিশু তার নিজের কণ্ঠস্বর বুঝতে পারে। যে শিশু বধির ও বোবা সে সরবে কাঁদবে না, কেবল চোখের জল পড়বে। তার 'বুলি'ও ফুটবে না। উচ্চকণ্ঠে শিশুর কান্নাকে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ও লোকসাহিত্যে 'উভরায়'

[< ঊর্ধ্বরাব] বলা হয়। পেট না ভরলে সে আরো খেতে চায়, বিশেষ ধরনের কান্না কেঁদে তা জানায়। খাওয়াব পর শিশুকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে পিঠে মৃদু আঘাত করলেই তার ঢেঁকুর উঠবে। [একে বলে wind breaking]।

খুব অল্প বয়সেই শিশু হাসতে শেখে। দাঁত ওঠার আগে, শিশুর হাসিকে দেখে, প্রিয় জনেরা ছড়া কাটে,—'অদন্তের হাসি, দেখতে ভালোবাসি'। অপর শিশুর সঙ্গে তার ব্যবহার কিংবা অচেনা পরিবেশে গিয়ে চারিদিকে তাকানোর মধ্যে তার I.Q [= Intelligence Quotient] ধরা পড়ে। সাত-আট মাস বয়সে কোনো কাজের অনুকরণ করতে পারে। অনুকরণ করাই শিশুর ধর্ম।

আগেকার দিনে পল্লী অঞ্চলে কাঁসার ঝিনুক চলিত ছিল না। ঝিনুক আসলে শুক্তি, এক প্রকার জলজ প্রাণী। দেখতে কুষির মতো দুটি জোড়া থাকে। পূর্ববঙ্গেঝিনাই, ঝিনুই < ঝিনুক। পাশ্চাত্য দেশে চামচে করে শিশুকে খাওয়ানো হয়। রূপোর চামচ সাচ্ছল্যের প্রতীক [প্রবাদ : 'রূপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মানো']। সেদেশে কথাই আছে, born with a silver spoon in one's mouth। ছ-মাস বয়স হলে শিশুর পাকস্থলীতে এক ধরনের spasm বা আক্ষেপ হতে থাকে; অর্থাৎ পাকস্থলী তরল পদার্থের বদলে কঠিন পদার্থ প্রত্যাশা করে। এই জন্য মনুসংহিতা বলেছে, শিশুর ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন করানো উচিত। অন্নের প্রথম ভোজন শিশুর জীবনের আর এক ঘটনা। মেদিনীপুরের পল্লী অঞ্চলে একে বলে—'ভুজনো'। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা বলে, 'ভাত ছোঁয়ানী'। সাধারণ বাঙলা ভাষায় 'মুখে ভাত'। কখনো শুধুই 'ভাত' ['আজ ছেলের ভাত']। কিংবা, 'ভাতের দিন এসো'।

অন্নপ্রাশনে পূর্বপুরুষের উদ্দেশে অন্ন-পিণ্ডাদি নিবেদন করতে হয়। এইজন্য আভ্যুদয়িক-বৃদ্ধি-নান্দীমুখ ইত্যাদি করতে হয়। শিশুকে মুকুটে ও নববস্ত্রে শোভিত করা হয়। প্রথম অন্ন মাতুল তুলে দেয়, সোনার আংটি বা রূপোর চামচে। পঞ্চ ব্যঞ্জনাদি রান্না করা হয়, পরমান্ন একটি আবশ্যিক উপকরণ। কেউ কেউ দেবতার প্রসাদ প্রথমেই শিশুর মুখে দেয়। শিশু খেতে পারে না, তথাপি বয়স্ক মানুষের মতো তাকে সব কিছু, খাওয়াবার অভিনয়

করা হয়। এমন কি, 'খড়কে' দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করবার অভিনয়ও হয়ে থাকে। শিশুকে থালা-বাটি, জামা কাপড়, খেলনা, নগদ টাকা, অলঙ্কার ইত্যাদি উপহার দেওয়া হয়। ইদানীং ইংরাজি কেতায় শিশুকে রূপোর চামচ দেওয়া হচ্ছে।

আঠারো মাসের আগে শিশুর প্রথম মস্তক মুণ্ডন হয় না। পূর্ববঙ্গে বিশ্বাস আছে, ঘন বর্ষায় মাথা মুড়োলে মাথার চুলও ঘন হবে। বৈষ্ণব প্রভাবিত অঞ্চলে শিশুর চূড়াকরণ ও কর্ণবেধ হয়ে থাকে, যেমন হয় উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে। কারো বা প্রথম চুল 'মানত' থাকে। চুলে জট বেঁধে যায়। কাঁচা তেঁতুল যেমন গাছে ঝোলে, মাথা নাড়ালে চুলের জটাও তেমনি— বীরভূমে এই উপমা চলে। তারাশঙ্কর তাঁর একটি রচনায় সে কথা বলেছেন। প্রথম চুল যত্র-তত্র ফেলতে নেই। দেবতার 'স্থানে', কিংবা অন্য কোনো বিশুদ্ধ স্থানে তা ফেলা হয়। শিশুর জন্মবারে কখনোই এটি করা হবে না। কেননা, এ দেহের অংশের কর্তন,—জন্মবারে মৃত্যুর সংযোগ থাকতে পারে, এই আশঙ্কা এখানে কাজ করে।

কমবেশি দু-বছর বয়সে মুসলমান পুরুষ শিশুর 'খত্না' [Circumcision]— একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। আরবী ভাষায় একে বলে 'সুন্নত'। ইহুদীদেরও 'সুন্নত' হয়ে থাকে। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এর কিছু বঙ্গীভবন ঘটেছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রথাটির উল্লেখ করছি। উঠোনে পিঁড়ি পেতে শিশুকে বসানো হয় কিংবা কেউ তাকে কোলে নিয়ে বসে। মহিলারা সচরাচর এ দৃশ্য পরিহার করে। শিশুর সামনে থাকে ক্ষীরের বাটি। ক্ষীর বলতে মুসলমান সমাজে পায়েস। সাধারণত বাতাসা দিয়ে তা তৈরি হয়। হাজাম [নাপিত] ইমাম প্রমুখেরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এ কাজ করে থাকে। অভিজাত সমাজে ডাক্তার ডাকারও প্রথা আছে। লোকজন নিমন্ত্রিত হয়।

এই সময়ে শিশুর দাঁত ওঠে [dentition]। 'Teething child' একটি ইডিয়ম, কেউ খিট্‌খিটে হয়ে উঠলে এ-কথা বলা হয়। কেননা দন্তোদ্‌গমের কালে শিশুর মেজাজ খিট্‌খিটে হয়। সব কিছুকেই কামড়াতে চায়, এমনকি

মায়ের স্তন পর্যন্ত। মাতার পক্ষে এ-খুব যন্ত্রণাদায়ক। পুরাণ বলে, এই ভাবেই শিশু কৃষ্ণ পুতনারাক্ষসীকে বধ করেছিলেন। প্রথমে শিশুর নিচের পাটির এক জোড়া দাঁত ওঠে। দুধ-দাঁতকে বলে, milk tooth। দুধ দাঁত পড়ে, আবার নতুন দাঁত ওঠা, milk dentition। দাঁত ওঠা, [to] cut the teeth। Long in the tooth, ইডিয়মের দিক থেকে অর্থ হলে—বুড়ো [তখন দাঁতের মাড়ি সরে যাবার ফলে দাঁত বড়ো দেখায়, এই জন্যে]। দাঁতের সজ্জাকে মুক্তোর সঙ্গে উপমিত করবার প্রথা আছে। ইঁদুরের মতো দাঁত হোক, এ অনেকেরই কাম্য। এই জন্যে শিশুর প্রথম-পড়া দাঁত ইঁদুরের গর্তে দিয়ে বলতে হয়, ইঁদুর, তোমার দাঁত আমায় দিয়ে আমারও দাঁত তুমি নাও [আসল কথা এই : ইঁদুরের দাঁত ক্রমেই বড়ো হতে থাকে। এই জন্যে যে কোন পদার্থে দাঁত ঘষে ছোট করে নেয়। লোকে মনে করে ইঁদুরের দাঁত খুব মজবুত ও সুসজ্জিত]। কমবেশি ১৬-২১ বছর বয়সের মধ্যে ওঠে wisdom tooth, বাঙলায় বলে—'আক্কেল দাঁত। এই দাঁত মাড়ির শেষ দাঁত। খুবই যন্ত্রণা দায়ক বলে সঙ্গত কারণেই একে 'আক্কেল দাঁত' বলা হয়।

দাঁতের ব্যথা এক সাধারণ ঘটনা। এই ব্যথা নিবারণের জন্য নানা Folk medicine-ব্যবহৃত হয়। পেয়ারার পাতা জলে সেদ্ধ করে সেই জলে কুলি করা; প্রদীপের শীষের আগুনে হলুদ গরম করে সেঁক দেওয়া প্রভৃতি। শিশুর দাঁতে কিন্তু পোকা লাগে না। দাঁত ক্ষয়ে যাওয়া আসলে শিশুর acidity-র ফল। বেদেরা যে দাঁতের পোকা ফেলে—তা হিপনটিজিম— তারা চলে গেলেই পোকা অদৃশ্য হয়।

চিত হয়ে শুয়ে দুই গোড়ালি ঘষে-ঘষে আপন শিয়রের দিকে শিশুর জীবনের প্রথম চলা। পূর্ববঙ্গে একেই বলে শিশুর 'উজান বাওয়া'। তারপর উপুড় হওয়া, দু-হাত, দু-পা, মিলিয়ে হামাগুড়ি দেবার প্রস্তুতি। পূর্ববঙ্গে বলে 'খুঁটি হওয়া', যেন চারটি খুঁটির ওপর শিশুটি আছে। এই অবস্থায় শিশু, চলতে থাকলে মনে হয়—একটি কচ্ছপ হেঁটে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা এই পর্যায়ের শিশুকে বলে 'কছুয়া/কাছুয়া ছোয়া' [< কচ্ছপ + উয়া]। তারপর

শিশুর দাঁড়ানো, শেষে কারো হাত ধরে চলা, যা 'হাঁটি-হাঁটি পা-পা'। লক্ষণীয়, যে হাঁটাচ্ছে, তারই উত্তমপুরুষে এটি ব্যক্ত হয়। শিশুর সঙ্গে কথা বলবার সময়, কিংবা তার কোনো কাজকে সর্বদাই বক্তার বা কারকের উত্তমপুরুষ ব্যবহৃত হয়। এতে বক্তা ও কারক নিজেকে শিশুর সঙ্গে Identify করে। কেননা, শিশুর নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি এখনও প্রাধান্য পায় না।

শিশুর নানা রকম রোগ-ব্যাধি হয়ে থাকে, অথচ সে তা বলে বোঝাতে পারে না। দুই পা কচলে-কচলে যদি কাঁদে, তবে বুঝতে হবে,— তার পেটে ব্যথা হচ্ছে, মা নিশ্চয়ই অতি পরিমাণে লঙ্কা খেয়েছে। ঘন-ঘন বমি করলে বুঝতে হবে, বয়স্বদের কারো মাথা থেকে তার মাথায় উকুন এসেছে। সঘন মলত্যাগ শিশুর পক্ষে ভালো, কিন্তু বয়স্কদের পক্ষে বিপজ্জনক। ছড়ায় বলে :

'শিশু হাগে চরতে।
বুড়ো হাগে মরতে।।'

সর্দিকাশি হলে, খাঁটি সরষের তেলে কালো জিরে-রসুন ফুটিয়ে সেই তেল সারা শরীরে মালিশ করা হয়। তুলসীপাতার রস খাঁটি মধু দিয়ে অল্প-অল্প করে খাওয়ানো হয়। শিশুর রোগ বিশেষকে গ্রামাঞ্চলে 'পেঁচোয় পাওয়া' বলে। বর্ধমান জেলাতে শিশুর রোগবিশেষকে বলে 'দ্যান ওঠা' [দানব শব্দজাত 'দানো'র প্রভাব থাকতে পারে]। শিশুর যে কোন অসুখকেই বলা হয় কারো 'নজর লাগা' বা কুদৃষ্টিতে পড়া। এইজন্য অনেক সময় ওঝার শরণাপন্ন হতে দেখা যায়। ওঝা মন্ত্রপূত জল দেয়, তাকে বলে 'জল-পড়া', সেই জল খাওয়ানো হয় শিশুকে। অপরের কুদৃষ্টি কাটাবার জন্য শিশুর সৌন্দর্যের হানি করে দেওয়া হয় কাজলের একটি টিপ কপালের বাঁ দিকে এঁকে দিয়ে। কেননা নিখুঁত এবং সুদর্শন শিশুর প্রতিই মন্দ লোকের কুনজর পড়ে। কোমরে কালো 'কারে' তামার পয়সা ফুটো করে বেঁধে দেওয়া হয়। কেউ দেয় সঙ্গে কানা-করা কড়ি। 'কানাকড়ি' ইডিয়মটির উদ্ভব এখান থেকেই। তপ্ত শলাকা দিয়ে তামার পয়সা বা কড়িকে কানা করা হয়। অনেকের ধারণা, দেহের সঙ্গে তামার সংযোগ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

অনেক বয়স্কদেরও এই জন্য তামা ধারণ করতে দেখা যায়। কোমরের সুতো/কারকে বলে 'ঘুন্‌সি'। কোমরে 'ঘুন্টি'ও থাকে, তাকে বলে 'পুঁটে'।

শিশুর পেটের অসুখ হলে পূর্ববঙ্গের মানুষদের, বিশেষত মহিলাদের বিশ্বাস, কুকুরের লোম শিশুর খাদ্যের সঙ্গে তার পেটে গেছে। এজন্যে প্রায়ই শোনা যায়, 'কুত্তায় লোম ফ্যালাইছে।' দু-পায়ের ফাঁক দিয়ে শিশু যদি পেছন দিকে তাকায়, তবে বুঝতে হবে—শীঘ্রই শিশু কঠিন অসুখে পড়বে। বিড়াল ষষ্ঠীর বাহন, অতএব বাড়িতে বিড়াল কাঁদলে শিশুর রোগ আসন্ন। মায়ের স্তন চুলকোলেও শিশুর রোগ আসন্ন বলে মনে করতে হবে। এর প্রতিরোধক হল, শিশুর পিতার বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে সেই স্তন চুলকে নেওয়া। বাঘের নখ বা দাঁত সোনা বা রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে শিশুর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। বাণের 'কাদম্বরী'তে সোনায় মোড়া বাঘনখের কথা আছে। এর দুটি অর্থ : বাঘের নখ ও দাঁতের কোনো জৈব রাসায়নিক প্রভাব শিশুর দেহে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। কিংবা জাদু বোধ : নখ-দাঁতের তীক্ষ্ণতা রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে রোগকে দূর করে দেবে। 'রোগ' এখানে এক দুষ্ট চরিত্র রূপে কল্পিত। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষদের বিশ্বাস, অজগর সাপের পিত্ত শিশুদের পক্ষে মহৌষধ [—'চট্টাগ্রামের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্য' : নব্যভারত : অগ্রহায়ণ, ১৩১৪। শ্যামাচরণ সরকার]। পশ্চিমবঙ্গে রামায়ণ গানের আসরে মূল গায়েনের হাতের চামর দিয়ে শিশুদের রোগ-ব্যাধি দূর করবার চেষ্টা দেখা যায়। শিশুদের এজন্যে আসরে সম্মুখে মূল গায়েনের হাতের কাছে ঠেলে দেওয়া হয়। শিশু-যেন এখানে লব-কুশের প্রতীক।

শিশুর সঙ্গে বয়স্কদের ব্যবহারের ফলে কিছু ফ্রেজ-ইডিয়ম-প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে। শিশুকে অতি আদর-যত্ন করা নিন্দার্থে 'পুতুপুতু করা' [< পুত্র]। অতি আদরের সন্তানকে 'মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিঁপড়েয় খায়।' ধনীর ঘরের আদরের সন্তান—'আলালের ঘরের দুলাল'। সন্তানকে আদর দিয়ে বাঁদর তৈরি করা।' 'গোল্লায় যাওয়া', 'জাহান্নামে যাওয়া'। 'ননীর পুতুল' ব্যাঙ্গে। এটির মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব থাকা সম্ভব।

অপরিচিত শিশু, শিশুর অনির্দিষ্ট নাম, আদর ও অনাদরের নাম, মূল নামের সংক্ষেপ সাধন, দিন-ক্ষণ-বার-তিথি অনুসারে নামকরণ—সবই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার বিষয়। নামকরণতত্ত্বকে বলা হয় onomastics/ onomatology। ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব—দুদিক থেকেই তা আলোচ্য। নীচে তার দু-একটির দৃষ্টান্ত দিলাম।

অপত্য মমতায় শিশুকে বহুসময়েই বলা হয়, 'বাছা' [< বৎস], 'বাছনি'। শেষোক্তটির প্রয়োগ আধুনিক যুগে নেই। শ্রীকৃষ্ণ এবং গৌরাঙ্গদেবের বাল্যলীলার প্রভাবে এবং সেই পরিবেশ-অনুষঙ্গে অনেক নামের সৃষ্টি হয়েছে। গোপাল, গোরা, বাঁশি, 'নইনা' [< ননী + ইয়া, পূর্ববঙ্গে], প্রভৃতি। খোকা, খুকু, খুকুরানী, প্রভৃতিকে আধুনিক যুগে 'বাপ' শব্দজাত < বাপ + ঈ > বাপী' হঠিয়ে দিয়েছে। পূর্ববঙ্গে পুরুষ শিশুকে 'নসু' [< নহুষ = মানুষ + উক] যেমন বলে পশ্চিমবঙ্গে কন্যা শিশুকে বলে 'নসুবালা' ['হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের একটি স্ত্রীচরিত্রের নাম]। পূর্ববঙ্গে আদরার্থে মেলে 'নৈসা' [< নহুষ + ইয়া]। রাঢ় বঙ্গে 'টুসু' ও 'ভাদু' নাম মেলে। টুসু থেকে 'টিসিন'। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে পাই, 'বাউ' [< বাপু], 'মাই' [< মাতৃকা]। সেখানে একটি কাব্যিক প্রয়োগ প্রচলিত : 'বাবজী' [< বাবাজীবন]। বিহার সংলগ্ন রাঢ়ে ক্বচিৎ মেলে 'নুনু' [ছোটো এবং সুন্দর অর্থে। মিথিলা থেকে পাওয়া বিদ্যাপতির পদে 'নুনুঙা' পদটি মিলেছে। বিহারের উক্ত অঞ্চলে কালো রঙের সুগন্ধ ধান থেকে যে চাল হয়, তাকে বলে 'নুনিয়া', 'নেনিয়া']। বাঙলায় রামা-শ্যামা-যদু ইংরেজিতে Tom, Dick, Harry।

শিশুর নামকরণের ক্ষেত্রে নানা প্রকার মনস্তত্ত্ব কাজ করে। মায়ের এক সন্তানের মৃত্যুর পর জাত সন্তান যেন হারানো ধনকে ফিরে পাওয়া, নাম হয় তাই 'হারাধন'। একমাত্র সন্তান—'নীলমণি', 'সবে ধন নীল মণি'—মূলত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণে রেখে, যশোদার মনস্তত্ত্ব দিয়ে। পূর্ববঙ্গে পূর্ববর্তী সন্তানের মৃত্যুর পর জাত সন্তানের নাম—মরইণ্যা [< মরণ + ইয়া]। পূর্ববর্তী সন্তানের মৃত্যুর পর জাত সন্তানের দেহে পূর্ববর্তী সন্তানের কোনো বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

একে বলে Metem psychosis। যেমন, শহীদ ক্ষুদিরামের গানে আছে : 'দশমাস দশদিন পরে, জন্ম নেব মাসির ঘরে, চিনতে যদি না পারিস মা, গলায় দেখবি ফাঁসি।' আসামের বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে এটি বিশেষ ভাবে দেখা যায়।

ভদ্রেতর সমাজে দিন-ক্ষণ-মাস-বৎসর-ঋতুকে নামকরণের ক্ষেত্রে খুব প্রাধান্য দেওয়া হয়। উত্তর ভারতে রবি বার দিন যে শিশু জন্মায়, তাকে 'এতোয়ার' [< আদিত্য + ইক + আর; আদিত্য = সূর্য] নাম দেবার প্রথা খুবই প্রচলিত। পূর্ববঙ্গে 'রইব্যা' [< রবি+ ইয়া]। গোটা শ্রাবণ মাস জুড়ে সেখানে 'মনসামঙ্গল' গাওয়া হয়, যার অপর নাম 'ভাসান গান'। ওই সময়ে জাত কন্যার নাম হয়—'ভাসানী'। 'পদ্মা' [মনসার অপর নাম] নামও খুব চলিত। মঙ্গলবারের জাতিকা—'মঙ্গলী'। এই রকম, উত্তর ভারতে 'শনিয়া' 'সোমরা'। বুধবারের জাতিকা,—'বুধা', 'বুধু', 'বুধনী'। শুক্রবারের জাতক, 'শুক্‌রা'। মঙ্গলবারের জাতক—'মঙ্গলু', কিন্তু পূর্ববঙ্গে 'মংলা' [মঙ্গল + আ]। ভুটিয়াদের মধ্যে এই প্রথা বিশেষ কার্যকরী। নামের আগে জন্মবার উল্লিখিত হয়। যেমন নামের আগে 'লাকপা' থাকলে বুঝতে হবে বুধবার তার জন্ম।

উত্তরবঙ্গের বাজবংশী সমাজের শিশুর নামকরণের নানা উদাহরণ মৎ প্রণীত 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' এবং 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা' এই বই দু'টিতে পাওয়া যাবে। তবু, দু-একটি অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত এই : 'শিয়ালু' [< শিয়াল + উক], তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' নাটকের একটি অপ্রধান চরিত্র। হয়তো জন্মকালে শেয়াল ডেকেছিল। হিঁয়ালু [< হিম + আলু], হিম অর্থাৎ শীতের ঋতুতে যার জন্ম। সাকালু [সকাল বেলায় যায় জন্ম], পোহাতু [< প্রভাত + উক] ইত্যাদি। সাধারণ বাঙালির কাছে উষা, সন্ধ্যা, প্রভাত, নিশীথ প্রভৃতি নাম বেশ পরিচিত। প্রধানত এগুলি কালবাচক। কার্তিক, হেমন্ত, বসন্ত, ফাল্গুনী, চৈতালি প্রভৃতি ঋতুবাচক নামকরণও উল্লেখযোগ্য। রাজবংশী সমাজে মাসবাচক নাম খুবই মেলে : বৈশাগু, জ্যেঠু, আষাড়ু, শাওনা, আশিনা, কার্তিকা, আঘোনা, [কন্যার বেলায় 'পুষুণা' পুষুনা < পৌষাণী], চৈতা। বার

অনুসারে : সোমারু [কিন্তু কন্যার বেলায় 'সোমারী'], বিসাদু [বৃহস্পিতিবার], বুধারু প্রভৃতি। সংক্রান্তির দিন জাত—দোমাসু [দুমাসের সন্ধি লগ্নে]। আমাসু— অমাবস্যার দিনে জাত।

শিশুর দৈহিক বিশেষত্ব এবং মানসিক প্রকৃতি অনুসারেও নামকরণ হয়ে থাকে। মূলত এগুলি Pejorative বা নিন্দাত্মক। যেমন নড় বড় করে চলে যে —'ন্যাড় বেড়ু'। উপবাসে জীর্ণ শরীর যার—উপাসু [নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈতালিক' উপন্যাসের একটি চরিত্র]। দৈহিক বিশেষত্ববাচক আরো নাম পূর্বোক্ত 'ছেঁড়াতার' নাটকে মেলে। গোরা, কেলো। পুঁটি, পুংলিঙ্গে পুঁটিরাম [< প্রোষ্ঠী, পুঁটি মাছের মতো ছোটখাটো], খেঁদা, খেঁদি, বুঁচী। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে 'খ্যান্দা'।

আদিবাসী সমাজে শিশুর নামকরণের জন্য দ্রষ্টব্য :' রাভাশিশুর নামকরণ প্রসঙ্গে' : সৌরভ, ফাল্গুন, ১৩২৪; পৃ. ১১৯-১২১; গোপালচন্দ্র নিয়োগীর প্রবন্ধ: 'হো-দের কথা' [প্রবাসী। কার্তিক, ১৩২১। পৃ. ২৭-৩২] প্রবন্ধে অসিতকুমার হালদার লিখেছেন, ঠাকুরদার নামেই হো-শিশুর নামকরণ হয়ে থাকে। আত্মীয়-স্বজনেরা একটি পাত্রে জল নিয়ে এক-একজন এক-একটি ধান ফেলে। যদি সেই জলে বেশি পরিমাণে ধান ভাসে তবেই শিশুর নাম ঠাকুরদার নামে হবে। হো-রা যে ধান্যজীবী, এই প্রথা থেকে তা প্রমাণিত হয়। একটি মুরগীকে হত্যা করতে করতে, যে নাম উচ্চারণ কালে মুরগীর প্রাণবায়ু নির্গত হবে, রাভাগণ তারই নামে শিশুর নাম রাখে।

একদা পরাধীন ভারতবর্ষে অনেক দেশপ্রেমিক বা বীরনায়কের নামে শিশুর নামকরণের প্রথা ছিল। আধ্যাত্মিকতার কারণে ঠাকুর্-দেবতার নামও খুব প্রাধান্য পায়। এইসব নামের মধ্যাংশে 'চরণ', 'পদ' ব্যবহৃত হয় সমাসবদ্ধ পদ রূপে। এছাড়া পাই বয়স্কদের নাম : শিশুপাল, শিশুতোষ, শিশুরঞ্জন॥

৬.

শিশুর সাজ-বেশ নাওয়া-খাওয়া, ঘুম-স্বপ্ন প্রভৃতি নিয়ে শিশুচারণার একটি বড়ো দিক গড়ে উঠেছে। শিশুকে খেলানো ও ভোলানো একটি পারিবারিক নিত্যকর্ম। এজন্যে গান-ছড়ার আশ্রয় নেওয়া হয়। এ কাজকে বলা হয় 'ছেলে ভুলানো', 'ছোয়াভুলকানী' ও 'ছোয়া নিন্দানী' [প্রান্ত উত্তরবঙ্গে], 'নিচুকনী' [আসামে], 'ছা-খেলানিয়া' গান বা ছড়া। ছেলে ভুলানো ছড়া'র বিচারের একটি দৃষ্টিকোণ হল, ছড়ায় যা-যা বলা হয়, কার্যেও তা করা। এই কার্য হল ছড়ার প্রত্যক্ষ রূপ। বয়স্কদের ছড়াতেও এ রীতি লক্ষণীয়। এ বিষয়ে অন্যত্র ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। বুদ্ধদেব বসুর একটি গল্পে আছে, ঘুমের অভিনয় করতে গিয়ে মা নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন! শিশু ঘুমোয় নি!

শিশুকে বহন করবার জন্য কোল-কাঁধ-পিঠ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কথাই আছে—'কোলে-পিঠে করে মানুষ করা'। পূর্ববঙ্গে—'নাকের পোঁটা [< শিঙ্ঘানিকা, শিকনী] গাইল্যা' মানুষ করা। দুগ্ধ জীবিতার কথা স্মরণ করে বলা হয়, গাল টিপলে দুধের গন্ধ মেলে। দৈহিক দৈর্ঘ্যের কথা স্মরণ করে, বয়স্ক মানুষকে বলা হয়—'হাঁটুর বয়সী'। এক ফোঁটা ছেলে, এক রত্তি মেয়ে, ইংরাজিতে A mite of a child। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জননীরা শিশুকে পিঠে কাপড় বেঁধে এখানে সেখানে যাতায়াত করে। চা-বাগানের শ্রমিক জননীরা শিশুকে সম্মুখে কাপড়ে বেঁধে ঝুলিয়ে নেয়, কারণ পেছনে থাকে চা-পাতা তোলার ঝুড়ি। তারা গান গায় :

'আগে বাটে ছোউয়া, পিছে বাটে টোকড়ি,
ঘুম্-ঘুম্‌কে পাতি তোড়েলা।'

বেড়াল মুখে করে শাবক বহন করে।

আদিম ও অনগ্রসর সমাজে এখনও কোনো শক্ত বস্ত্রখণ্ডের দুই প্রান্ত গাছের ডালে বেঁধে শিশুকে দোলা দেওয়া হয়। কোলে নিয়ে হাঁটু দুলিয়েও শিশুকে দোলা দেওয়া হয়ে থাকে। কোনো কর্মের পুনরাবৃত্তির মধ্যে ছন্দ

থাকে, যা নিদ্রাকর্ষক। দোলা বা হাতের চাপড় হল সেই পুনরাবৃত্তির দিক। বাঁশ বেত দিয়ে তৈরি হয় নানা ধরনের দোলনা [cradle]। দোলনায় দোলা দিতে-দিতে যে গান গাওয়া হয়, তা হল—Cradle song/Lullaby। দোলনাই শিশুর জীবনের প্রথমপর্ব। সমগ্র জীবন বোঝাতে তাই ইংরাজি ফ্রেজ : From the Cradle to the grave।

শিশুর ঘুম ও স্বপ্নকে নিয়ে সুন্দর Sleeplore বা 'নিদ্রাচারণা'র সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, ঘুম-পাড়ানী মাসী-পিসীর কল্পনা। মাসী শিশুর মায়ের দিক, আর পিসী তার বাপের দিক। বংশধারার দুই থেকে আগত এই যুগল কাল্পনিক নারী চরিত্র শিশুর চোখেই উপবেশন করে,—সম্ভবত দুই চোখের জন্যই এই যুগল চরিত্রের কল্পনা। বাটাভরা পান খান এঁরা। সন্ধ্যার চাঁদ [আদরার্থে, চাঁদ + আ = চাঁদা] এবং সকালের সূর্য [আদরার্থে, সূর্য + ই = সূয্যি + আই = সূজ্জাই], দুজনেই মামা, মায়ের দিক থেকে। এঁরা দেবে কপালে টিপ। শিশুর অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজনই মায়ের দিক থেকে। শিশুর গায়ে হামের মতো. চর্মরোগ বিশেষ হলে সুভাষণে [Ephimism] তাকে 'মাসী-পিসী' বলা হয়। সূর্যের মতো উজ্জ্বল ছেলে—'সূর্য উজাল ছেলে। পূর্ববঙ্গ গীতিকায় পাই, 'উজ্যাল'।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে মাসী-পিসীর বদলে 'নিন্ পইরী' [< নিদ্রাপরী]-র কল্পনা করা হয়। কখনো বলা হয় 'নিন্দোয়ালী'। নিদ্রার ভাবকে বলে 'নিদুটি'। [< নিন্দ + ওয়ালী বা আলী]। পরী একটি ফরাসি শব্দ, অর্থ হল—যার ডানা আছে [ফারসি ভাষায় ডানাকে 'পর' বলা হয়। পর আছে যার, সেই 'পরী']। এরা আকাশচারী, সুন্দরী, ভারতীয় কল্পনায় অপ্সরাদের মতো। এই পরীরা তিন বোন। সবচেয়ে ছোট বোনের নাম—'হামীকাটী' [ঘুমের আগে হাই ওঠে। হামী > হাই]। মেজো বোনের নাম—'ঢুলপইরী' [হাইয়ের পর 'ঢুলুনী' আসে]। আর সবচেয়ে বড়ো বোনের নাম —'নিন্ পইরী'। এ বিষয়ে যে গান আছে, সে জন্য মৎ প্রণীত 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' বইটি দ্রষ্টব্য।

গান ছাড়াও, অনেক সময় মায়ের নিজস্ব প্রয়োজনে এক coercive measure রূপে শিশুকে আফিঙ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখার রীতি পৃথিবীর অনেক দেশেই চলিত আছে। একে বলে 'opiate করা'। [opium-এর ক্রিয়াবাচক শব্দ। উল্লেখ্য, অফিংখোরদের আড্ডাখানাকে opium den বলে। চণ্ডুখোরদের বলে—opium smoker]। একদা চীন প্রভৃতি দেশে বয়স্কদেরও opiate করা হত। আঙুলের ডগায় করে কৌটোতে রাখা আফিং অতি অল্পমাত্রায় নিয়ে শিশুর মুখে দিলে সে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে, ইতিমধ্যে মায়েরা তাদের কাজ-কর্ম সেরে নেয়।

ঘুমের মধ্যেই শিশু হাসে-কাঁদে, একে বলে শিশুর 'দেয়ালা' [< দেবলীলা] করা। এখানেও মায়ের প্রাধান্য। কল্পনা করা হয়, শিশুর মামা-বাড়িতে আগুন লেগেছে, সেই কারণে শিশু কেঁদে ওঠে। হাসিও মামা বাড়ির সৌভাগ্যের কারণেই।

দুরন্ত বা দুষ্ট শিশুকে কখনো ভয় দেখানো হয়। 'Fear object'গুলি দু-ধরনের। কেবল শিশুরই জন্য, এবং সেগুলি কাল্পনিক ব্যক্তি-বস্তু-প্রাণী। যেমন, 'জুজুবুড়ি', 'কানকাটা' কন্দকাটা, কবন্ধ; [তার চোখ দুটি বুকের দু দিকে]। উত্তরবঙ্গে মেলে : 'কানকাটাটা আইসেছে ঝিত্ মারিয়া থাক' [স্কন্ধকাটা আসছে, চুপ করে থাক]। বাঙলা সন্নিহিত বিহার অঞ্চলের ছড়া :

'আয় রে 'ফুচুতিগাইয়া' [এক কাল্পনিক প্রাণী],
আগুা পট্‌পট্ যো
তোহার আগুা আগ [আগুন] লাগে,
অমুককে—[শিশুর নাম] খেলা দো।।

ইংরাজিতে Humpty-Dumpty : রূপকথায় বর্ণিত ডিম্বাকৃতির মানুষ, কখনো একটি ডিমেরই দু-টি অংশ। এর সঙ্গে তুলনীয়, 'কুমড়ো পটাস' নামের চরিত্র। দ্বিতীয়ত যা বয়স্কদের ভীতিপ্রদ এবং যা বাস্তব। যেমন উত্তরবঙ্গে বিশ্বাস আছে, সন্ধ্যাবেলায় পূর্বদিকে হরিণ কাঁদলে সেদিন রাতে গ্রামে হাতির

পাল আসবে। আগাতি [< অগ্র + তি, পূর্বদিক] হরিণ কান্দেছে [কাঁদছে], ওরে শিশু চুপ কর। যে বছর বেশি পরিমাণে কাশ ফুল হবে, সে বছর হাতির উপদ্রব বাড়বে। এই রকম, দক্ষিণ ভারত থেকে বর্গীদের আগমন, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে ['গর্কী' বলে] প্রভৃতি বয়স্কদের ভীতি শিশুর মনে সঞ্চারিত হয়। শিশুর কিছু বোধশক্তি এলে তাকে বাঘ-ভালুকের সঙ্গে ভূতের ভয় দেখানো হয়, আরো বড়ো হলে ভূতের গল্প, রূপকথা প্রভৃতি বলা হয়। শিশুর এই মানসিকতার পুষ্টি সাধনে বাঙলা সাহিত্যে বহুবিধ গ্রন্থরচনা করা হয়েছে। যাদের অনেকগুলির সঙ্গেই বিজ্ঞ পাঠকগণ পরিচিত। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য : 'শিশুসাহিত্যে ভূতের গল্প' [বিচিত্রা : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯] : সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 'শিশুর চরিত্র গঠনে রূপকথার স্থান' [বিচিত্রা : অগ্রহায়ণ, ১৩৪২] : গৌরী চক্রবর্তী। বুদ্ধদেব বসুর 'সাহিত্যচর্চা' [বৈশাখ, ১৩৬৩] বইয়ের অন্তর্গত 'বাংলা শিশুসাহিত্য' [পৃ. ৪৭-৮২] প্রবন্ধ, যা ১৯৫২ সনে লিখিত। 'শিশু সাহিত্য' [প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১] : অনাথনাথ বসু।

পারিবারিক সংস্কৃতি ও আর্থিক সংগঠন অনুসারে, পিতা-মাতার ইচ্ছার অভিক্ষেপণ [Projection] শিশুর কাছে বলা ছড়াতে মেলে। পুরুষ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন, কর্ম ও বিবাহ যেমন উল্লিখিত হয়, কন্যা শিশুরও বিবাহ এবং শ্বশুর বাড়ির কাল্পনিক ভবিষ্যৎ জীবন তেমনি মেলে। Child marriage বা শিশু-বিবাহের প্রথা-এর পিছনে একটি বড়ো কারণ। খুবই ছোটো-ছোটো শিশুদের থালায় বা কুলোয় শুইয়ে বিবাহ দেওয়া হত। তাদের বয়স হলে আর একবার বিয়ে হত। পূর্ববঙ্গে একে বলা হত 'দ্বিত্যাবিয়া' [< দ্বিতীয় + ইয়া]। ১৯২৯ সালে সারদা আইন [The Child marriage Restraint Act XIX of 1929] পাশ করে শিশু-বিবাহ প্রথা রোধ করবার চেষ্টা হয়। কিন্তু ছড়ায়-গানে তার প্রসঙ্গ রয়ে গেছে।

শিশুর সাজের একটি প্রধান উপাদান হলো কাজল [< কজ্জল]। যে আধারে কাজল থাকে তাকে বলে 'কাজললতা', [< লৈত্রিক, লতা Haplology বা সমাক্ষর লোপে 'কাজলতা'] গ্রাম বাঙলায় 'কাজলতা'। উড়িয়া ভাষায়

'কাজলপাতি', সংস্কৃতে 'অঞ্জন যষ্টিকা'। প্রদীপের শিখায় কাজল তৈরিকে বলে,—'কাজল পাড়ানো'। কিন্তু চোখে কাজল দেওয়া—'কাজল পরা'। কাজল চোখের পক্ষে উপকারী, শিশুকে দেখতে নাকি এতে সুন্দরতর লাগে। তাই তার কপালের বাঁ দিকে একটি ফোঁটা দিয়ে তাকে খুঁতযুক্ত করে দেওয়া হয়, যাতে 'কু-নজর' [evil eye] না লাগে। মুসলমান সমাজে 'সুর্মা'র [ফরাসি শব্দ] ব্যবহার করা হয়। অতি আধুনিক যুগে শিশুদের জন্য নামী কোম্পানীর পাউডারের প্রচলন হয়েছে। তবে শিশুদের Talcum Powder না লাগানেই ভালো। [Talcum হলো এক ধরণের কোমল ও রূপালী ধাতু বিশেষ]।

স্বাভাবিক কারণেই শিশুর কাঁথা চাই। জীর্ণ ও পুরাতন কাপড় পর-পর রেখে, oblong আকৃতির লম্বা-লম্বা ফোঁড় দিয়ে কাঁথা তৈরি হয়। মূলত Tailor bird বা টুনটুনির বা বাবুই-এর কাছ থেকে মানুষ এটি শিখেছে। ঠোঁট দিয়ে পাতার শিরা চিরে সুতো তৈরি করে, একটি পাতার দুই মুখ এই ভাবে সেলাই করে টুনটুনি প্রভৃতি পাখিরা বাসা তৈরি করে। কাঁথা তৈরি করা হয় লম্বা সেলাই করে আয়ত চতুষ্কোণগুলি ক্রমেই ছোটো হতে থাকে। মজবুত করবার জন্য কখনো দু-বার সেলাই করা হয়, অর্থাৎ এক ফোঁড় দিয়ে ঘুরিয়ে আবার সেলাই করা হয় [ফারসি ভাষায় একে বলে 'বখিয়া' বাঙলায় 'বখেয়া', ইংরাজিতে Back stitch]। সৌন্দর্যের জন্য দেওয়া হয় ট্যাঁরা চিহ্নের মতো সেলাই, ইংরাজিতে cross stitch। কাঁথা সেলাইয়ের আধুনিক পরিণাম 'কাঁথা stich' শাড়ি। কাঁথা থেকেই বয়স্কদের জন্য 'নকশী কাঁথা'র সৃষ্টি হয়েছে। আরো নানা ধরণের ফোঁড় প্রচলিত আছে।

কাঁথার জন্য পৃথকভাবে সুতো কেনা হয় না। শাড়ির নানা রঙের পাড় থেকে তা সংগৃহীত হয়। পা ছড়িয়ে বসে পায়ের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে পাড়ের একপ্রান্ত জড়িয়ে নিয়ে, ফাড়া পাড় থেকে সুতো সংগ্রহ করা হয়। ইংরাজিতে বলে Shoddy; তাই দিয়ে তৈরি বস্ত্রকেও বলা হয় Shoddy cloth; বয়স্কদের নক্‌শী কাঁথার সঙ্গে যা বিশেষভাবে তুলনীয়।

শিশুর মাথায় দেওয়া হয় সরষে পোরা বালিশ। মাথার আয়তন অনুসারে

সামান্য গর্ত করে তাতেই শিশুর মাথা রক্ষিত হয়। অনেকের বিশ্বাস, শিশুর Cephal অর্থাৎ মাথার চতুর্দিকের মধ্যে পেছনের দিকটি যত বেড়ে থাকবে, ততোই সে বুদ্ধিহীন হবে। বুদ্ধিমান ও প্রতিভাধর ব্যক্তির মাথার পেছনের দিকটি চাপা থাকে। তবে শিশুর ঘাড় শক্ত থাকে না বলে, ঘাড়কে স্থির রাখবার জন্য ওই গর্তটির বিশেষ ভূমিকা থাকে। যাতে শিশু ভয় না পায়, চমকে না ওঠে, মা যেন পাশেই আছে,—এজন্যে তার দুপাশে লম্বা বালিশ দেওয়া হয়, যাকে বলে 'পাশবালিশ'। শিশু প্রথমে চিত হয়েই শুয়ে থাকে, ক্রমে অন্যান্য ভাবেও শোয়। বয়স্ক মানুষ কুঁজো হয়ে শুতে ভালোবাসে, কেননা গর্ভবাস কালে শিশু ওই ভাবেই থাকে।

শিশুর মুখে থাকে 'চুষি' বা 'চুষিকাঠি'। এও শিশুকে ভোলাবার জন্য, যেন সে মায়ের কাছেই আছে। এ-বস্তু আসলে রবারের তৈরি 'চুচুক'। তার খেলনাও বটে। এককালে কাশীতে কাঠের নানা শিশু-খেলনা পাওয়া যেত, প্রায়ই হত লাল রঙের—হয় হাতে মুঠো করে ধরবার জন্য নয়তো একটু বড়ো শিশুর জন্য গড়িয়ে খেলবার গোলাকার বস্তু। অনেক শিশু Colour blind বা 'রঙ-কানা' হয়। তবে লাল রঙ অধিকাংশ শিশুকেই নাকি আকৃষ্ট করে। তার জামা-জুতো [তুলনীয় : 'লাল জুতুয়া'] খেলনা— সবই লাল রঙের। 'রাঙা টুকটুকে' ইডিয়মটির উদ্ভব কি এখানে থেকেই? উল্লেখ্য, জন্মকালে যে শিশুর রঙ যতো লাল হবে, সে ততো কালো হবে। শিশুর কানের রঙই তার প্রকৃত রঙ। যাই হোক, রঙের পর শব্দ শিশুকে আকৃষ্ট করে। এই জন্য শব্দকারক 'ঝুম ঝুমি' তাকে দেওয়া হয়। শিশুর মুঠিতে যে লাল কাঠের খেলনা দেওয়া হয়, পূর্ববঙ্গে তাকে 'ললা' বলা হয়। [নলাকৃতির— নল + আ = নলা > ললা]

মুখের লালা বা লাল পড়ে যাতে বুকের জামা না ভেজে তার জন্য লালানিরোধক বা Bib, ব্যবহার করা হয়; পরিধেয় হলো Nappy [Napkin-এর সংক্ষিপ্ত রূপ], Knickerboker [জামা-প্যান্ট একসঙ্গে], Diaper [কোমরের পরিধেয়], —বলাই বাহুল্য, আগেকার দিনে এ-সব ছিল না। একটি তিন কোণা

বস্ত্রের দুই প্রান্ত বেঁধে দিয়ে, মধ্যের অংশ পেটে বেঁধে দেওয়া হত। পুরুষ শিশু অধিকাংশ সময়ে দিগম্বরই থাকে। Oil Cloth-এর প্রচলন ছিল না। শীতের দিনে কেউ কেউ কলার পাতা বা মানকচুর পাতা ব্যবহার করত। মায়েব আঁচল কাঁথার অভাব পূরণ করত। এখনকার নরম 'সফ্‌ট্‌টয়' কাঠের খেলনাকে দূর করে দিয়েছে।

শিশুর বয়সের ক্রমবর্ধমানতা অনুসারের তার খেলার প্রকৃতি ও উপকরণ বিবর্তিত হতে থাকে। প্রথমেই শিশু চায় 'দোলা-দুলুনি'; 'ঘুঘু সই', 'ধোপার নাচন'—প্রভৃতি খেলা। তারপর 'কাতুকুতু খেলা', 'চোখ বুজানি খেলা' [পূর্ব-বঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলের]---প্রভৃতি দৈহিক নানা দিককে নিয়ে। এগুলিতে কোনো property > Prop-এর প্রয়োজন হয় না। শিশুর সঙ্গে অপর একজন থাকলেই এ খেলা চলতে পারে। খেলার সঙ্গী এখানে সহযোগী। শিশু যতোই বয়স অর্জন করবে, ততোই এই সহযোগী চরিত্র প্রতিযোগী চরিত্রে পরিণত হবে। অবোধ ও ভাষাজ্ঞানহীন শিশুকে নাচানো এবং সে সময়ে কথিত ছড়াও কেবল এক তরফা,—যে নাচায়, তারই আনন্দে তাকে নাচায়। শিশুর ছড়াকে এই দৃষ্টিতে নতুন করে বিচার-সমীক্ষা করা প্রয়োজন।

শিশুর জীবনের সঙ্গে একটি পারিবারিক জীবন জড়িত থাকে। এ বিষয়ে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন মোঃ এনামুল হক : 'ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন' [বিচিত্রা। আশ্বিন, ১৩৩৫] ॥

৭.

ক্রমে শিশুর বয়স বাড়তে থাকে। সে কথা বলতে শেখে, লেখা-পড়া শুরু করে, খেলা-ধূলোর ধারা পাল্টে যায়।

কথা বলা শেখার আগে শিশু মুখে নানা রকম অব্যক্ত বুলি বলে। অনেকটা দুই বেড়ালের ঝগড়ার মতো শোনায়। পূর্ববঙ্গের মায়েরা একে তাই বলে, 'বেড়ালের ঝগড়া'। যে শিশু বধির ও বোবা হবে, সে কিন্তু কোনো 'বুলি'

ধরে না। তার হাসি-কান্না দুইই রব-শূন্য। শিশুর আবোল-তাবোল কথাকে বলা হয় 'Prattle' করা। সে যদি বিরক্তিকর পাকা-পাকা কথা বলে, তাকে বলে 'কপ্‌চানো'। আন্তর্জাতিক চোরদের অপভাষায় শিশুদের বলা হয়—'Kinchin'।

প্রথমেই শিশু সম্পূর্ণ বাক্য বলতে পারে না, বাক্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়, কর্তা-ক্রিয়া-কর্মের সন্নিবেশ ঠিকঠাক হয় না। ভাষা বিজ্ঞানের মতে একে বলা যেতে পারে—Brachylogy। অনেক সময় ভাবকে প্রকাশ করতে গিয়ে শিশুরা 'তোতলামি' করে। কিছুদিন পরেই তা সেরে যায়। কেউ কেউ স্থায়ী ভাবে এ রোগের শিকার হয়ে যায়। জিভের তলায় সুপুরি বা ওই জাতীয় কিছু দিলে সুফল মেলে।

বয়স্করা যখন শিশুর সঙ্গে কথা বলে, তখন তারাও খাঁটি ও প্রকৃত ভাষা ব্যবহার করে না। তারাও এক ধরনের Affected ভঙ্গিতে কথা বলে এবং শিশুর সঙ্গে নিজেকে Identify করে নেয়। এর ফলে, মূল ও প্রকৃত ভাষার মধ্যে আসে নানা পরিবর্তন। যেমন 'এখন আমরা খাবো', এখানে 'আমরা' বলতে শিশু এবং বয়স্ক কেউ, লক্ষ্য কিন্তু 'আমি'। অর্থাৎ ভাষাহীন শিশু নিজে।

'পথের পাঁচালি'তে বিভূতিভূষণ অপুর প্রথম অর্থহীন ভাষা এইভাবে উল্লেখ করেছেন : 'জে- জে- জে- জে।' আরো বড়ো হলে শিশু কোনো-কোনো Syllable উচ্চারণ করতে পারে না, কিংবা নিজের মতো করে বিকল্প উচ্চারণ করে। যেমন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'নীলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসে : 'কী ঠব্বোনাশ [সর্বনাশ] শৈল টাকা [কাকা] এসেছে।' আরো একটু বড়ো হলে একটি বাক্যের উচ্চারণে কি বিশেষত্ব এসে পড়ে, তা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নিধুবাবুর টপ্পাগানের একটি পঙক্তির উদাহরণে স্পষ্ট হয়েছে : 'তোলা [তোরা] দাসনে দাসনে [যাসনে যাসনে]...'। 'ইন্দিরা' উপন্যাসে শিশুর ভাষায় 'শাশুড়ি' হয়েছে 'ছাছুলি'; তালব্য শ-এর Palatisation খুবই স্বাভাবিক। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে রবীন্দ্রনাথ খোকাবাবুর ভাষার নিদর্শন দিয়েছেন : 'চন্ন [রাইচরণ] ফু..[ফুল]।' বাঙলা

সাহিত্যে শিশুর ভাষার কোনো সঙ্কলন নেই, তা নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা মাত্র একটি প্রবন্ধে অতি সম্প্রতি পেয়েছি।[১]

কখনো প্রত্যক্ষ onomatopoeia বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ দিয়ে শিশু কোনো ভাবকে ব্যক্ত করে। যেমন, 'ঘেউ, ঘেউ' মানে কুকুর, 'ম্যাও' মানে বেড়াল, 'হাম্বা' মানে গোরু। অনেক পদ প্রত্যয় নিষ্পন্ন হয়ে যায়, ড. সুকুমার সেন উ-কারের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছিলেন, যেহেতু শিশুকে চুম্বনের কালে ঠোঁট বর্তুল হয়ে যায়, উ-কারের উচ্চারণের সঙ্গে যার সাদৃশ্য আছে। উদাহরণ : দুধ, দুধু। ঘুম, ঘুমু। হয়তো পূর্ববর্তী উ-কার পরবর্তী উ-কারের আগম সম্ভাবিত করেছে। হসন্ত শব্দ স্বরান্ত হয়ে গেছে। শিশু নাকি ওষ্ঠ্য [Labfial] বর্ণ আগে শেখে, 'মা'র উচ্চারণ সহজেই করতে পারে। দন্ত্যবর্ণ, শ,ষ,স, উচ্চারণ করতে দেরি করে।

বয়সের তুলনায় যে শিশু বয়স্কদের মতো কথা বলে, সাধারণ বাঙলায় তাকে বলে 'পাকা-পাকা' কথা। ইডিয়ম মেলে, 'ইঁচড়ে পাকা'। শিশুর 'আধো-আধো বোল' অমৃতবৎ। কিন্তু তার অকালপক্কতায় অনেকেই বিরক্ত হন।

অনন্তর শিশুর লেখা-পড়া শুরু হচ্ছে। কোনো কোনো সমাজে সে বালাই নেই। তার মানে সে কিন্তু জগৎজীবন সম্পর্কে নির্বিকার থাকে না। নিজের হাতে-পায়ের আঙুল— কুড়িটি। সব কিছু 'in terms of scores' অর্থাৎ কুড়ি-কুড়ি হিসেবে গণনা করা আদিম সমাজেরই একটি লক্ষণ। বিশের বদলে সেখানে 'কুড়ি' ব্যবহৃত হয়। নিজের দেহের মধ্যেই আছে একটি Binarism : দুই হাত, দুই পা, দুই চোখ-কান; দেহের সম্মুখ-পশ্চাৎ, ওপর-নিচে। চলার সময় হাতের বিপরীতে থাকবে পা। দার্শনিকেরা 'Nativism' বলে একটা কথা বলে থাকেন, যার অর্থ : মানুষের কতকগুলি ধারণা সহজাত, শিশু সেই সহজাত ধারণাগুলি দ্বারাই চালিত হয়।

---

১. দ্রষ্টব্য ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী : 'শিশুর ভাষা' : 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা' ১৬ বর্ষ ১ সংখ্যা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত ও ধনবান বাঙালির কাছে শিশুর লেখা-পড়া অপেক্ষা সামাজিক সহবৎ শিক্ষা বড়ো ছিল। তখন ছড়া শোনা যেত : 'যদি পড়া না শিখে পো/তবে সহবতে থো।। [দ্রষ্টব্য : সহবৎ শিক্ষা : 'ভারতী'। অগ্রহায়ণ, ১৩০০ : মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়]। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গলে আছে, হাতে খড়ির পর লখীন্দর 'অষ্টশব্দ' ও 'অষ্টধাতু' পড়ল। ড. সুকুমার সেন এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন,—'সেকালে বর্ণ পরিচয় হইয়া গেলেই আটটি প্রধান শব্দের [নাম ও সর্বনাম], আটটি প্রধান ধাতুর রূপ মুখস্থ করিতে হইত। ইহাকে বলিত অষ্টশব্দী।'

লেখা শুরু হত কচি কলাপাতায়, এমন কি মাটিতে। শ্লেটের ওপর লেখা রীতিমতো শৌখিন ব্যাপার, কাগজে লেখা অকল্পনীয়। কলম বলতে খাগের কলম, কিংবা হাঁসের পাখার কলম, যা Quil নামে পরিচিত ছিল। এখনও সরস্বতী পুজোতে খাগের কলম, মাটির দোয়াত দেওয়া হয়। কালি বলতে চালের কালি কিংবা ভুষো কালি [Lamp black]। কড়াইতে চাল পোড়ানো হত, সম্পূর্ণ পুড়ে গেলে তা গুঁড়ো করা হত। লাউয়ের পাতার রস দিয়ে তা গোলা হত। 'ভুষোর কালি' নাম থেকেই বোঝা যায়, প্রদীপের শিখার কালি। শিখার ওপর কোনো পাত্র ধরে তার কালি সংগ্রহ করা হত। বাঁশের কঞ্চি তেরছা করে কেটে নিয়ে আরবি হরফে লেখা হত। এতে আরবী হরফের 'নোক্তা'[diacritical point] গুলি ভালো ওঠে।

সরস্বতী পুজোর দিন বাসন্তী রঙের ধুতি পরে, হলুদ মেখে স্নান করে, ছেলেদের 'হাতে খড়ি' হত। নাম থেকেই বোঝা যায়, স্লেটের ওপর 'খড়ি' [Chalk pencil] নয়, ডেলা খড়িদিয়ে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ প্রথম লিখত শিশুরা। পুরোহিত বা বাড়ির গুরুজন কেউ এই কর্ম করাতেন। 'হাতে খড়ি' কথাটি এখন ইডিয়মে পরিণত হয়েছে। কোনো শিক্ষা সম্পর্কীয় ব্যাপারের সূচনা বা আরম্ভ রূপে এটি এখন প্রযুক্ত হয়। একদা পূর্ববঙ্গের গভীর গ্রামাঞ্চলে সরস্বতী পুজোর দিন এক অশোভন প্রথার অনুষ্ঠান দেখা যেত। প্রতিমার সামনে, মাটিতে খাগের কলম রাখা হত। শিক্ষার্থী উপুড় হয়ে নিজের কপাল

সেই কলমে ঠেকাত । এইবার গুরুমশাই নিজের পা দিয়ে শিক্ষার্থীর মাথা কলমের ওপর চেপে ধরতেন। যদি কপালের সঙ্গে কলম উঠে আসত, তবে ধরে নেওয়া হত, তার কপালে লেখা-পড়া আছে! এখন, এ প্রথা বিলুপ্ত। অল্পশিক্ষিত পুরোহিতগণ সরস্বতীর সংস্কৃত পূজা-মন্ত্রের পর এই ছড়া এখনও বলেন : 'লাগ্ লাগ্ বিদ্যা মোর কণ্ঠে লাগ/যাবজ্জীবন তাবৎ থাক্।।'

'শিশুর অক্ষর' পরিচয় এক বড়ো সমস্যা। ইংরেজিতে 'A for apple.....' ইত্যাদি সকলেরই পরিচিত। 'অ-য় অজগর আসছে তেড়ে/ওই আমটি খাব পেড়ে;'—ইত্যাদিও পরিচিত। এসবই কিন্তু পড়বার জন্য, লেখবার সহায়ক রূপে নয়। এই প্রক্রিয়া Pictorial method নামে পরিচিত। জাপানী বর্ণমালা চিত্র-জ্ঞাপক। চিত্রদ্বারা লিখন পদ্ধতিতে বর্ণমালাকে নির্দেশ করবার রীতিকে বলে Pictograph। ছবির সাহায্যে Alphabet বা বর্ণমালার পরিচায়ক। কিন্তু লিখন-সহায়ক Mnemonic [স্মৃতি সহায়িকা] ছড়া আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। যে সব বর্ণমালায় খুব বেশি Curve থাকে. কিংবা একটানে যা লেখা যায় না, কলম তুলতেই হবে, সেখানে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে তা শেখা দুরূহ কাজ। শিশু লেখায় পাকা-পোক্ত হয়ে উঠলে, Pen lifting-এর বদলে, এক টানে লেখা শেখে। এককালে একে বলা হত 'জড়ানো লেখা'। যারা মসীজীবী বা লিখনজীবী তাদের Calligraphy বা সুন্দর হস্তাক্ষর অনেক আয়েসে শিখতে হত। পাণ্ডুলিপি লিখনের সঙ্গে চিত্রণ ও অলঙ্করণও শিখতেন তাঁরা। আদালতের মুহুরীরা যে বিশেষ ধরণের বর্ণমালার ব্যবহার করেন, তার মধ্যেও একটি ভাব কাজ করে। এঁরা প্রতিটি অক্ষরের [বর্ণের] শুঁড় ও ল্যাজ ব্যবহার করেন।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় লিখিত 'শতবর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ' [আর্যদর্শন। ফাল্গুন, ১২৯১] প্রবন্ধে, কিংবা 'সেকালের পাঠশালার কাহিনী' [ভারতী। বৈশাখ, ১৩০৩। পৃ. ৮] প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বর্ণ-পরিচয়-জ্ঞাপক স্মরণিকা ছড়া মেলে। যেমন : গণ্‌শাঁকড়ি-ক [ক-এর 'আঁকড়ি' টি গণেশের শুঁড়ের মতো]। মাথায় পাগড়ি-ঙ। ছেলে কাঁকালে-ঝ। পালানে/পালান পিঠে-ঞ [গোরুর পালানের

মতো বক্ররেখাযুক্ত]। হেঁট ভাঙ্গা-দ। কান মোচড়ান-ধ। মাথা চেরা-প। চিতল মুড়ো-ভ। তে-পুটুলি/নারকেল ঝোপা-শ। হল্‌হলে-হ। শিশুকে রূপকথা বলতে বলতে, সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো ছবি আঁকা হয়। একে বলে Pictorial folktale। তেমনি বর্ণ পরিচয়ের কালেও ছবি আঁকা হয়। যেমন, দ-র হল ঠ্যাং লম্বা, শেষে দেখা গেল এটি একটি পাখির ছবি হয়ে গেছে।

মনোমোহন সেন জানাচ্ছেন [সৌরভ। কার্তিক, ১৩১৯। পৃ ৩১-৩২], সেকালে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে, ণ-কে 'আণ' পড়া হত। রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রাম-অনুগ্রহ নারায়ণের বিদ্যারম্ভ' [ভারতী। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০। পৃ. ৯৯-১২৩] প্রবন্ধে বিহারের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিদ্যারম্ভের ও 'হরফপহচান' [অক্ষর পরিচয়] -এর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। যেমন,

ক— কা কো কোরোয়া। খ— খা বীজ খাট্টা। গ— গাবে লেবড়িয়া। ঘ— ঘা সে রোট্টা। ঙ— আপোক বান্দা। চ— চ তিনকোণা। বিদ্যাদেবীর কাছে বিদ্যা প্রার্থনার জন্য বিহারী পাঠশালায় বালকেরা বলে :

শিব শিব শঙ্করী।
শিব-গৌরী মহেশ্বরী।
বিদ্যা দে পরমেশ্বরী॥

পাঠশালাতে 'শির-পড়ুয়া' দ্বারা অর্থাৎ অভিজ্ঞ ও বরিষ্ঠ ছাত্রদের দ্বারা পড়ানো হত। রাজেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন : '.....'বালচট্' বা সর্দার-পড়ো দ্বারা শিক্ষাদান প্রণালী বঙ্গ ও বিহারের পাঠশালা সমূহে বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে।....বড় বড় পাঠশালায় দুই বা ততোধিক বালচট্ দৃষ্ট হয়, ইহারা গুরুজীর অধ্যাপনা কার্যের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। অনাবিষ্ট বালকদের শাসন করিতে, পলায়িত ছাত্রগণকে 'গুরুমহাশয়! গুরুমহাশয়! তোমার পড়ো হাজির। একদণ্ড ছেড়ে দাও ত জল খেয়ে বাঁচি'। ইত্যাকার কবিতা আওড়াইয়া, হস্তদ্বয় ও পদযুগল ধরিয়া ঝুলাইয়া লইয়া আসিতে, তাহারা তাঁহার দক্ষিণহস্ত।'

'ছাত্রগণ স্বহস্তে [বিহারে] গৃহ মার্জনা ও লেপন করিয়া থাকে। মার্জনাকালীন নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ করে :

রাম নাম লাড্ডু, গোপাল নাম ঘি,
হরিকে নাম মিছরী, ঘোর ঘোর পী॥

'অর্থাৎ [আইস আমরা] রামনামরূপ লাড্ডু, গোপাল নামরূপ ঘি ও হরিনাম রূপ মিছরী, এই তিন দ্রব্যে মিশ্রিত করিয়া পান করি।' 'চকচন্দ্রা' [অর্থাৎ 'নষ্টচন্দ্র'] ও ফাগুয়াতে গুরুজীরা ছাত্রদের কাছ থেকে পাওনা আদায় করতেন। সে বিষয়েও ছড়া আছে।

বিহারের মুসলমান বালকেরা আলিফ-বে-পে-তে-টে প্রভৃতির পর শেষে বলে : 'ইয়ে, বাদগস্ত ইয়ে—/ খোদা ইলিম দিজীয়ে॥' 'ইলিম' বাঙলায় 'এলেম হয়ে গেছে।

ন্যাকড়ার পুঁটুলি ভিজিয়ে শ্লেট মোছা হত, 'পথের পাঁচালি'তে বিভূতিভূষণ একে বলেছেন 'নেতি'। 'ডাউয়া'-নামে এক ধরনের টকমিষ্টি ফলের কচি ফল দিয়েও শ্লেট মোছা হত। কাঠ কয়লা দিয়ে ঘষলে শ্লেট খুব পরিষ্কার হত। ফ্রেমশূন্য শ্লেট দিয়ে, স্কুলের সন্নিহিত নয়ান জুলিতে, জলের ওপর শ্লেট আল্‌তো করে ছুঁড়ে দিয়ে খেলা হত। মোট কতোবার জলের ওপর দিয়ে গেল তা গণনা করা হত। বালকেরা বলত : 'দেখি, তোরটা ক-হাঁড়ি ভাত খায়, আর আমারটা ক-হাঁড়ি খায়।' যার যতো বেশি হাঁড়ি হবে, সেই জিতবে। শ্লেটের বদলে চ্যাপ্টা এক খণ্ড পাথর দিয়েও এই খেলা হয়। এই পাথরকে বলে Drake stone।

বিদ্যালয়ের শাস্তির কতকগুলি নির্দিষ্ট ধারা ছিল। দাঁড়ানো, বেঞ্চির ওপর দাঁড়ানো, হাঁটু গেড়ে থাকা প্রভৃতি এখনও আছে। তবে 'চেয়ার হওয়া', 'নাড়ু-গোপাল হওয়া', ঘাড়-পিঠ বাঁকিয়ে, কপালে থান ইঁট দিয়ে সূর্যের দিকে তাকানো-এসব অমানুষিক শাস্তি এখন আর নেই। Corporeal শাস্তিও হেড-মাস্টার বা অন্য কোনো শিক্ষকের দেবার অধিকার এখন নেই। এখন

বিদ্যালয়ের Penology বা দণ্ডবিধান অন্য রকমের। বিশেষ দোষ-অপরাধে ছাত্রদের স্কুল-কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হয়, যাকে বলা হয় Rusticate করা। ইংরেজ আমলে একটি নতুন শব্দের উদ্ভব হয়—'রাজটিকিট' করা।

স্কুলের ছাত্রদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ-রসিকতা, তাদের চালাকি-বোকামির দৃষ্টান্ত ইত্যাদি নিয়ে একটি ধারা গড়ে ওঠে—বিশ্বের সব দেশেই। আমি একে 'School-lore' বলতে চাই। বলা বাহুল্য শিশু এখানে বালকে পরিণত, কয়েকটি দৃষ্টান্ত : Panel game : বেতারে প্রচারিত, ক্রীড়াচ্ছলে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা। A dunce's Cap : তুলনীয় : 'গাধার টুপি' : বিদ্যালয়ের যে 'অঘা' [অজ্ঞ] ছাত্রকে শাস্তি দেবার জন্য কাগজের চূড়াকার টুপি পরানো হয়। Booby prize : সবচেয়ে অকৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ব্যঙ্গ করে যে পুরস্কার দেওয়া হয়। Booby trap : কক্ষে প্রবেশকারীকে দুয়ারের কাছেই আছাড় খাওয়ানো। জব্দ করার জন্য যে ফাঁদ পাতা হয়। ক্লাস পালানো ছেলে [Truancy] নানা রকম ওজর দেখায়। বগলের তলায় রসুন রাখলে নাকি সাময়িক জ্বর আসে, পড়া থেকে অব্যাহতি মেলে। এই জ্বরকে 'ভালুকের জ্বর' বলে, কারণ ভাল্লুকের জ্বর নাকি ক্ষণেই আসে, ক্ষণেই চলে যায়॥

৮.

আগেই বলেছি, শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর খেলার সঙ্গি এবং খেলার বিষয়—দুই-ই পাল্টে যায়। তার এই বিবর্তিত জীবনের দু-একটি খেলার নিদর্শন এখানে দিই।

কিছু খেলা আছে অভিনয়াত্মক [Imitative], অনুকরণও এতে থাকে। কিছু খেলা প্রতিযোগিতামূলক [Competative], কিছু খেলা গণনামূলক [Enumerative]। কিছু খেলা বসে বসে হয় [Sedentary]। খেলার এই শ্রেণীভাগ ও নামকরণ আমার মতো করে আমি করলাম, কিন্তু আরো নানা ভাবে তা করা যায়। যেমন কোনো উপকরণ [Prop] নিয়ে খেলা। কোনো

দেহ ও অঙ্গভঙ্গিমূলক খেলা। যতো অল্প বয়সের শিশু, তার খেলা ততো সরল, বলাই বাহুল্য। কিছু খেলা পরিবেশগত [Enviornmental],— জল-জলাশয়-নদী, বন-প্রান্তর, গাছ প্রভৃতিকে ঘিরে। এমনকি কিছু খেলা ঐতিহাসিক [Historical] হতে পারে। [তুলনীয় : ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে অনুষ্ঠিত নাটক : Celebratory Theatre] যেমন, তীতুমীরের বাঁশের কেল্লার স্মরণে উত্তর চব্বিশ পরগণায় বাঁশের কেল্লা খেলা। এভাবে খেলার সমীক্ষাকে কি Gamelore বলা যাবে?

অভিনয় : অনুকরণাত্মক খেলার মধ্যে মেয়েদের 'রান্না-বাড়ি' [পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণে 'রান্নাবাটি'] খেলা, ইংরাজিতে বলে [to] Play house। ছেলেদের লুকোচুরি [Bo-Peep/Hide and seek] খেলা আদিম শিকারের অভিনয়। এই খেলার প্রসারিত রূপ 'চোর-পুলিশ' কিন্তু অনুকরণ। 'কুমির-কুমির' খেলায় চোর-পুলিশের Extension রূপ থেকে কুমির ডাঙাতে এসে পড়তে চায়। বিক্রমপুরের 'হৈল ডুবাডুবি' [সলিল > হলিল > হৈল], খেলায় স্থলের লুকোচুরি জলের পরিবেশে বিস্তৃত। [দ্রষ্টব্য : বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ—হলদিয়া : বিক্রমপুর পত্রিকা : বৈশাখ, ১৩২২ : নগেন্দ্রলাল চন্দ্র] উত্তরবঙ্গে 'আমপাকা খেলায়' তেমনি গাছের ওপবে-নিচের ব্যবধান সৃষ্টি করে লুকোচুরি অনুষঙ্গকে প্রসারিত করা। লুকোচুরি যখন Hide এবং Seek তখন লুকোনোকে খুঁজে বের করাই বড়ো। Bo Peep-এর মধ্যে কেবল দূর থেকে দেখাটাই মুখ্য। আমেরিকায় 'চোর'কে Den এবং বুড়িকে It বলা হয়।

কপাটি, কবাটি, কাবাডি, হিন্দীতে কবড্ডী, নামান্তর হাডুডু [দীনবন্ধু মিত্র 'জামাইবারিক' নাটকে লিখেছেন - হেঁড়েডুডু] আসলে একটি অভিনয়মূলক খেলা, বিপক্ষের কাছ থেকে কিছু কেড়ে আনা। তবে 'দম' ধরে তা আনতে হবে। ডাণ্ডাগুলি লণ্ডনের মফস্বল বালকেরাও খেলে, ইংরাজিতে বলে Tip - Cat খেলা। গোটা বাংলায় এর নানা ক্রীড়ান্তর আছে। এ খেলা গণনমূলক এবং সে গণনা টাকা পয়সার এবং তা দিয়ে মানুষ ক্রয়ের কথা আছে।'এক্কা-দোক্কা' স্পষ্ট ভাবেই জমি ক্রয়ের অভিনয়।

বাঙলার 'বাঘ-বন্দী খেলা' ইংরাজিতে 'Fox and the geese' খেলার সঙ্গে তুলনীয়। কাণা-মাছি খেলায় যার চোখ বেঁধে দেওয়া হয়, তাকে বলে 'Hoodman'। ইংরেজ শিশুদের খেলা Hare and the hound , স্পষ্টতই শিকারের অভিনয়। এ খেলা চোর-পুলিশ জাতীয়। ছ-জন কাগজের টুকরো ছড়াতে ছড়াতে ছুটে পালায়, অন্যেরা তাদের ধরবার চেষ্টা করে। যেন শিকারী খরগোস শিকার করতে চাইছে।

Seek অর্থাৎ খুঁজে বের করা এবং প্রতিপক্ষকে ছুঁয়ে দেওয়া,—এসব খেলার দুটো বড় Motif । একদা প্রতিপক্ষকে শারীরিক ভাবে পরাভূত করা এখন ছুঁয়ে দেবার সঙ্কেতে পরিণত। ভারতীয় খেলায় এখানে 'মোড়' শব্দ উচ্চারিত হয়। 'মোড়' একটি মারাঠি শব্দ, এর অর্থ 'পরাজয়'। সমবেত খেলায় গুরুত্বহীন বালক-বালিকাকে 'দুধভাত' বা 'এলেবেলে' বলা হয়। খেলার দল তৈরি করতে নানা রকম পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়। 'গণনা' 'নামপাতানো' প্রভৃতি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। উত্তর চব্বিশ পরগণায় একে বলে 'ভাগানো' [< ভাগ + আনো]।

ভেঁপু, হিন্দিতে 'ভোংপু' শিশুদের আর এক খেলার বিষয়। তালপাতার ভেঁপু, আম আঁটির ভেঁপু, সোঁদাল পাতার বাঁশি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আষাঢ় মাস নাগাদ আমের আঁটি ভেদ করে আমের চারা বের হয়। খোলা ভেঙে, ঘষে নিয়ে, চারার ফাঁকে ফুঁ দিলেই তা বাজে। মেলায় তালপাতার ভেঁপু বিক্রয় হয়। বিশেষত রথের মেলায়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা মনে পড়ে?

৯.

শাস্ত্রমতে শিশুর পঞ্চম বৎসর থেকে দশমবর্ষ কালকে—'পোগণ্ড কাল' বলা হয়। 'পোগণ্ড' থেকে সেই বিষয়ক 'পৌগণ্ড', স্ত্রীলিঙ্গে 'পৌগণ্ডী'। 'ন পোগণ্ড' এই অর্থে 'অপোগণ্ড'। অর্থাৎ ষোলো বছরের বেশি যার বয়স। অপর মতে,

পাঁচ থেকে দশ বা পনের বছর বয়স। শিশুর এই 'পৌগণ্ডকাল'ই আলোচ্য নিবন্ধের বিষয়। অতঃপর Adolescence বা বয়ঃসন্ধির কাল।

পঞ্চবর্ষ বয়স্ক শিশুকে নানা কর্মে নিযুক্ত করা হয়। যেমন, জাদুকর্মে, কোনো অপরাধীকে শনাক্ত করতে তাকে নিযুক্ত করা হয়। ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী সমাজে পঞ্চ-বর্ষীয় শিশুকে বলি দেওয়া হয়, কৃষিক্ষেত্রে উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য। যেমন, আদিবাসী খন্দ-দের মধ্যে এ-প্রথা প্রচলিত। তারকচন্দ্র রায় তাঁর 'খন্দমহল ভ্রমণ' [ভারতী। ভাদ্র, ১৩১৭। পৃ. ৩৬৬-৩৭৩] প্রবন্ধে লিখেছেন :

'নরবলি প্রথাকে খন্দগণ 'মেরিয়া' বলে। অনাবৃষ্টি হইলে তাহারা মনে করিত পৃথিবী দেবী ক্রুদ্ধা হইয়াছেন এবং নরশোণিতে তাঁহার বক্ষোদেশ সিক্ত না করিয়া দিলে তাঁহার ক্রোধোপশম হইবে না। খন্দমহলে 'পান' নামে এক জাতি আছে। ইহাদের অনেকে বলির উপযোগী নরশিশুর ব্যবসা করিত।...ক্রীত শিশু পুষ্টিকর খাদ্যে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিলে, বলির দিনে মৃত্তিকা-প্রেথিত কাষ্ঠ খণ্ডে তাহাকে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া ছুরিকা দ্বারা তাহার গাত্রের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্তন করা হইত। কার্তিত মাংস লইয়া সমাগত জনগণ প্রত্যেকে নিজ-নিজ জমিতে প্রোথিত করিত। তাহাদের বিশ্বাস, তাহাতে জমির উর্বরতা শক্তি বর্ধিত হয়।...' কেবল ক্ষেত্রই নয়, কোনো সেতু বন্ধনের কালে বা মন্ত্র প্রতিষ্ঠার কালে, জড়বস্তুর প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য নরবলি ও নররক্ত প্রদানের বিশ্বাস চলিত আছে। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের বটু অভিজিৎকে বলেছে, উত্তরকূটের লোকেরা 'মানুষ বলি চায়। ..... সেই বেদী গাঁথবার সময় আমার দুই নাতনীর রক্ত ঢেলে দিয়েছে।....'

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি অঞ্চলে শ্যামাপূজার পরদিন শিশুদের একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হয়। একে বলে 'দর্পণ দর্শন', নরসুন্দরেরা সেই দর্পণ দেখায়। ছোটো ছেলে-মেয়েরা খুব ভোরে উঠে সাজসজ্জা করে। কাক ডাকার আগে সাজ-সজ্জা না করলে কাক সব রূপ হরণ করে নেবে বলে বিশ্বাস।— 'কাঁথির লোকাচার'

ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশয়ারের শিশুরা নিজেদের আয়ু গণনার জন্য একটি জাদুর আশ্রয় নেয়। শিশুরা চেরিগাছের তলায় সমবেত হয়ে বলে :

'Cuckoo, Cherry-tree,
come down and tell me,
How many years I have to live.'

এই বলে চেরি গাছটি ঝাঁকায়, যতোগুলি পাতা পড়বে, ততো বছর সে বাঁচবে।

তেমনি, পূর্ববঙ্গে শিশুর অন্নপ্রাশন কর্ণভেদ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের কালে পূর্ববঙ্গের মহিলারা 'কাদাখেলা'র [আঞ্চলিক ভাষায় 'প্যাঁক খেলা'; < পঙ্ক] আয়োজন করতেন।—'সোয়াশত বৎসর পূর্বে পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত পরিবারের সাংসারিক অবস্থা' [প্রতিভা। অগ্রহায়ণ, ১৩২৭; পৃ. ৩২২-৩২৭] : পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য।

মানুষের বার্ধক্যকে তার দ্বিতীয় শৈশব, Second Childhood বলা হয়। সচরাচর 'নিন্দার্থেই' তা ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধের শিশুসুলভ আচরণ আসলে তার 'ভীমরতি' গ্রস্ত হওয়া, তার Senility। কিন্তু এর একটি মনোরম দিকও আছে বলে মনে হয়। শিশুর জন্য লিখিত সাহিত্য—সকলেই জানেন, তাকেই বলে শিশু সাহিত্য। কিন্তু এ হল শিশুসাহিত্যের সহজ-স্থূল-স্পষ্ট সংজ্ঞা। আমাদের অনুমান, সেই সাহিত্যই আসল শিশু-সাহিত্য যা বৃদ্ধ ও বয়স্ককে তার শৈশবে নিয়ে যায়।

মানুষের মধ্যে শিশু কখনোই হারায় না। অমিয় চক্রবর্তীর কাছে লেখা একটি চিঠিতে [শান্তিনিকেতন, ৮ আশ্বিন, ১৩৪৩] রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'মানুষ শিশুকাল থেকে নানাভাবে আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় ক্ষুধিত, রূপকথার উদ্ভব তারি থেকে।' টি. এস. এলিয়ট বলেন, 'আপন-আপন শৈশবের স্মৃতি-অভিজ্ঞতা দিয়েই কবিরা তাঁদের কাব্যের চিত্রকল্প নির্মাণ করেন।' ফ্রয়েড এবং ইয়ুং [Jung]-এর মতে, শৈশবের স্মৃতি হারিয়ে ফেলা [Amnesia of Childhood] এক বিশেষ মনোরোগ। আমাদের মতে, জীবনে এর চেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য আর কিছু নেই॥

গ্রন্থঋণ

১. Samsad English-Bengali Dictionary [Sahitya Samsad, Kolkata : 9];
২. 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩. 'চলন্তিকা' : রাজশেখর বসু।
৪. 'তিনহাজার বছরের লোকায়ত জীবন' ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫. 'গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি' : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
৬. 'করুণানিধান বিলাস' : জয়নারায়ণ ঘোষাল।

□

পরিশিষ্ট : ক

[পূর্ণগর্ভা রমণীর নির্দিষ্ট সময়ে প্রসব না হলে, এই বারমাসী গান শোনালে তাঁর প্রসব হয় বলে রঙ্গপুর জেলার প্রচলিত বিশ্বাস]।

কন্যা বারমাসী[১]

রামের রাম রে হরি রাম নারায়ণ।
দেবের বল্লভ হরি কমললোচন॥
প্রথম অগ্রহায়ণ মাসে[২] নয়া হেঁউতি ধান[৩]।
কেও কাটে কেও মাড়ে কেহ করে নবান॥
ঘরে ঘরে আছে অন্ন আঁধে-বাড়ে[৪] খায়।
ঘরে ঘরে নাই অন্ন পরারর[৫] মুখে চায়॥
এই না মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি,[৬] নামিল পৌষ মাস॥
পৌষ না মাসেতে কন্যা লোকে খায় আলোয়া[৭]।
ডালে ফুল ফুটিয়াছে কেকিটি[৮] কমলা॥
কেকিটি কমলা ফুটে আরো ফুটে মালী।
তরুণ বয়সের বেলা ছাড়িলা সোয়ামী॥
এই না মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি' নামিল মাঘ মাস॥
মাঘ না মাসেতে কন্যা করুয়া[৯] পড়ে শীত।
তলে পাটী পাড়ে কন্যা শিওরে বালিশ॥
সাধু সাধু বলিয়া[১০] বালিশে দিলাম কোল্।
হতভাগা তূলার বালিশ না বোলে এক বোল[১১]॥
পোড়া দেঙ[১২] তোর তূলার বালিশ, গগনে উঠুক ধুঁয়া।
কতদিনে ফিরিবে অভাগিনীর চন্দ্রমুয়া[১৩]॥
এই মাস গেল কন্যা, না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি' নামিল ফাগুন মাস॥
ফাগুন মাসেতে কন্যা, ফাগুয়া খেলায় রাজা[১৪]।
ডাল-মূল ভাঙ্গিয়া যখন কুহুনী তোলায় ভাসা[১৫]॥

তোলাও রে তোলাও রে কুহুনী পাড়িয়া মারিম ছাও[১৬]।
আমার দেশে নাই সাধু, সাধুর দেশে যাও ॥
গাছে পড়ি পঞ্চকথা[১৭] সাধুরে বুঝাও।
এই মাস[১৮] গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি' নামিল চৈত্র মাস॥
চৈত্র না মাসেতে কন্যা পচিয়া বয় বাও[১৯]।
হেটে[২০] তালু শুকায় কন্যার মুখে না আসে রাও[২১] ॥
মুখে না আসে রাও হে কন্যা চক্ষে না ধরে নিন্দ।
হাতে হাতে চন্দ্র দিয়া হারাইলাম গোবিন্দ॥
এই মাস গেল কন্যা, না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি' আসিল বৈশাখ মাস[২২]॥
'বৈশাখ মাসেতে হে কন্যা সুশাগ ললিতা।
সব সখী খায় শাগ অভাগীর মুখে তিতা॥
আঁধিয়া-বাড়িয়া অন্ন শোঙ্গরাইলাম[২৩] পাতে।
আমার ঘরে নাই সাধু পশিয়া দিব[২৪] কাকে ?
এই মাস গেল কন্যার, না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি' আসিল জ্যৈষ্ঠ মাস॥
জ্যৈষ্ঠ না মাসেতে কন্যা জেটুয়া[২৫] পাকে আম।
....
আম খাইলাম কাঁটাল হে খাইলাম, আরও গাভীর দুধ।
কতদিনে খণ্ডিবে অভাগীর মনের দুখ॥
এই মাস গেল কন্যার, না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি' নামিল আষাঢ় মাস॥
আষাঢ় মাসেতে হে কন্যা কিষ্‌ষাণে[২৬] কাটে ধান।
কোড়া পাখীর কান্দনেতে[২৭] শরীর কম্পমান॥
হেঁওয়া পাখীর কান্দনেতে[২৮] পাঁজার[২৯] কৈল শেষ।
ডাউকির কান্দনেতে[৩০] মুঞঞ ছাড়িনু বাপের দেশ॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।

লহরী যৌবন তুলি' নামিল শ্রাবণ মাস ।।
শ্রাবণ মাসেতে কন্যা কিয্‌ষাণে ওয় ওয়া[৩১] ।
হাড়িকোণে করিছে মেঘ, গগনে বর্ষে দেওয়া[৩২] ।।
বর্ষেক রে, বর্ষেক রে দেওয়া, বর্ষেক পঞ্চধারে ।
আমার ঘরে নাই সাধু, ফিরিয়া আসুক ঘরে ।।
এই মাস গেল কন্যার, না পূরিল আশ ।
লহরী যৌবন ধরি' নামিল ভাদ্রমাস ।।
ভাদ্র না মাসেতে হে কন্যা পাকিয়া পড়ে তাল ।
জুগীর জুগানী লইয়া হস্তে লব তাল[৩৩] ।।
হস্তে লব তাল হে প্রিয়, মাগিয়া খাব দেশে ।
দুই কানে দুই কুণ্ডল পিন্দিয়া[৩৪] যাব সাধুর দেশে ।।
এই মাস গেল কন্যা, না পূরিল আশ ।
লহরী যৌবন ধরি' নামিল আশ্বিন মাস ।।
আশ্বিন মাসে হে কন্যা, দুর্গা অষ্টমী ।
ধানে-দূর্বায় করে পূজা বিধবা ব্রাহ্মণী ।।
পূজুক পূজুক[৩৫] পূজা মাগিয়া লব বর ।
আমার সাধু ফিরলে দিব লক্ষ ছাগল ।।
এহ মাস গেল কন্যার না পূরিল আশ ।
লহরী যৌবন ধরি' নামিল কার্তিক মাস ।।
কার্তিক মাসেতে হে কন্যা তুলসীর গোড়ে বাতি[৩৬] ।
ঘুরি' আসে তোমার সাধু, কান্ধে লয়া ছাতি ।।
আসুক আসুক সাধু, বসুক আমার পাশে ।
এলাঙ্গ[৩৭] সুপারী দিব নাটুয়ার বেশে[৩৮] ।।
বারমাসী তের পদ নেও বইন গণিয়া ।
এই পদ ভুলিয়া গেছে[৩৯] জয়ধর বানিয়া ।।
জয়ধর বানিয়ার বাপ নামে প্রজাপতি ।
দো পাঁয়ায় ভুণাইছে[৪০] পদ কন্যা-বার মাসী ।।
এক মনে এক চিত্তে শুনে গর্ভবতী নারী ।
তাহার ছাইলা হইলে হবে লঙ্কার অধিকারী ।।

জয়ধর বানিয়া যে পদ্মাবতীর বাপ।
যে বা গায় যে বা শুনে তার খণ্ডে পাপ[৪১] ॥

১. সঙ্কলক পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মন্তব্য করেছেন : 'মাঠে শ্রম ক্লিষ্ট কৃষকের বা গোষ্ঠ প্রত্যাবর্তিত রাখালের গান অনেকেই শ্রবণ করিয়া থাকিবেন।.....রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব স্টেশন মাষ্টার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ সরকার মহাশয় কতিপয় কৃষকের মুখে শুনিয়া ইহা সংগ্রহ করেন। প্রবাদ, পূর্ণ গর্ভবতী রমণী নিরূপিত সময়ে প্রসূতা না হইলে তাহাকে এই গানটি সম্পূর্ণ শুনাইলে তাহার সুপ্রসব হয়।' ২. এই বারোমাসী গান অগ্রহায়ণ থেকে শুরু হচ্ছে, যা প্রাচীনতার সূচক ৩. নতুন হৈমন্তিক ধান ৪. বাঁধে-বাড়ে ৫. পরের। পরার + র = পরারর, ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বিত্ব প্রয়োগ ৬. দেহে যৌবনের 'লহরী' বা ঢেউ তুলে, কাব্য ভাষার বিশেষত্ব। মাসকে নারী রূপে কল্পনা করা হয়েছে ৭. তামাক পাতা ৮. [?] ৯. কম ১০. বিদেশগত বণিক স্বামীর নাম স্মরণ করে ১১. একটিও কথা বলে না ১২. দিই ১৩. চন্দ্রমুখা স্বামী ১৪. খেলে। প্রয়োজক ক্রিয়া নয়। আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য অঞ্চলে এই সময়ে 'ধূলিয়া রাজা'র গান গাওয়া হয় ১৫. 'কুহু' রবকারিণী 'কোকিলা' বাসা তৈরি করে; কাব্য ভাষা ১৬. শাবক > ছাও। গাছ থেকে পেড়ে তোর শাবককে মেরে ফেলব ১৭. অনেক কথা, কাব্য ভাষার বিশেষত্ব ১৮. এই মাসও ১৯. পশ্চিম দিকের বাতাস বয় ২০. এখানে, এদিকে ২১. আরাব > রাব > রাও, মুখের ভাষা ২২. সুশাক নালিতা, পাটের শাক এই অঞ্চলের এক প্রিয় খাদ্য ২৩. বেড়ে দিলাম [?] ২৪. পরিবেশন করব ২৫. <জ্যৈষ্ঠ + উয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসের ২৬. কৃষাণে ২৭. বর্ষার জলজ পাখী। বিরহের প্রতীক রূপে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে গৃহীত ২৮. বিরহের প্রতীক রূপে গৃহীত পাখি বিশেষ ২৯. পঞ্জর ৩০. ডাহুকীর ৩১. ধানের চারা [রোয়া] রোপণ করে ৩২. উত্তর-পশ্চিম কোণকে 'হাঁড়িয়া কোণ' বলা হয়। এই কোণে মেঘ জমলে বৃষ্টি হবেই ৩৩. যোগীর যোগিনী সেজে [?] সম্ভবত নাথ যোগী-যোগিনীদের কথা বলা হচ্ছে ৩৪. দুই কানে কুণ্ডল পরে, এদের 'কান ফাড়া' যোগী বলা হয় ৩৫. সমধাতুজ কর্ম, ঔপভাবিক বিশেষত্ব ৩৬. পূর্ব পুরুষের উদ্দেশে 'আকাশ প্রদীপে'-র পরিবর্তে তুলসীর মূলে বাতি দান ৩৭. এলাচ + লবঙ্গ একত্র মিশ্রিত হয়ে 'তোরঙ্গ শব্দ' নির্মাণ করেছে ৩৮. নর্তকীর বেশে [?]

৩৯. 'ভণিতা' দিয়ে গেছে, রচনা করে গেছে ৪০. ভণিতা দিয়ে রচনা করেছে, নামধাতু। দ্বিপদী বা দুই পয়ারে [অর্থাৎ দুই শ্লোকে] তা রচনা করেছে ৪১. [রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৫ ২য় সংখ্যা] : পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

'জয়ধর বানিয়া' [বণিক + ইকার]-র কাহিনী একদা আসাম, ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গে বিশেষ, প্রচলিত ছিল। তবে 'জয়ধরে'র বদলে 'জয়ধন' নামটিও শোনা যায়। 'ভারতকোষে' মহেশ্বর নেওগ লিখেছেন, 'জয়ধন বানিয়ার বারমাহি গীতে' মাণিক নামে বণিক নিজের স্ত্রীর সতীত্ব পরীক্ষার জন্য ছদ্মবেশে অবৈধ প্রণয় নিবেদন করে, কিন্তু স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করতে পারল না। শেষে স্ত্রীর কাছে আপন পরিচয় প্রদান করে। এর সঙ্গে সপ্তদশ, শতাব্দীর রোসাঙ্গের কবি দৌলতকাজীর 'লোর-চন্দ্রানী' র .ব্যর সাদৃশ্য আছে।

বারমাসী গানকে ভারতীয় লোকসাহিত্যে নানা প্রকারে গ্রহণ করা হয়েছে। কখনো খণ্ডগীতি রূপে, কখনো কোনো দীর্ঘ আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত গান রূপে। সর্বত্রই বিরহগীতি রূপে এবং নারীর বিরহকে ব্যক্ত করতে প্রযুক্ত। নায়কের বাণিজ্য যাত্রা বা বিদেশে গমনের সঙ্গে নায়িকার বারমাসী যুক্ত। একটি কারণ, অপরটি কার্য। বাঙলা গীতিকা-ব্যালাডের একটি Motif বিরহ ও কারুণ্য। এই জন্য বারমাসী, [এমন কি ভগ্নাংশিক বারমাসী] গান 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র মধ্যেও দেখা যায়।

উত্তরবঙ্গে কারুণ্যের প্রতীক রূপে সীতা অপেক্ষা বেহুলাকেই গ্রহণ করা হয়েছে। 'বেহুলা' নামটির ব্যুৎপত্তিও এখানে উল্লেখযোগ্য। ড. সুকুমার সেনের মতে বিধুরা > বেহুলা। 'মনসামঙ্গলে'র আঞ্চলিক উপস্থাপনের মধ্যে বেহুলার দুঃখ কারুণ্যকে ব্যক্ত করতে যে সব খণ্ডগীতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার সবই এইভাবে মধ্যযুগীয় সাহিত্যকে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছে।

উত্তরবঙ্গের মাহুতগণ অরণ্য থেকে হাতি ধরে আনবার পর, হাতিকে বশ করবার জন্য বিশেষ ধরণের বারমাসী গান শোনায় [একে 'হস্তী-বারমাসী' বলে। 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' বইতে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছি], মন্ত্র হিসেবে। অরণ্য যেন হাতির পিত্রালয়, মাহুত তাকে অপহরণ করে এনেছে। পিত্রালয়ের জন্য হস্তীর বেদনা মানুষের ভাষায় তাকেই শোনানো হয়। যেমন অনেক বারমাসী

গানের পর নায়ক-নায়িকার মিলনে সুখ-সমাপ্তি ঘটে, তারই সদৃশ-জাদুতে, গর্ভবতী নারীও সুপ্রসবের পর শান্তিলাভ করবে, এই আশায় তাকে বারমাসী গান শোনানো হয়। যুক্তির দিক থেকে বিচার করলে, এ-এক ধরণের Music Therapy। যেমন, সাপকাটী রোগীকে ওঝারা মন্ত্র হিসেবে গান শোনায়।

মধ্যযুগের সাহিত্যে নায়িকার দুঃখ-বিরহ প্রকাশ মানেই 'বারমাসীগান' গাওয়া। উৎকল দেশে যে কোন প্রকার বিলাপগীতিই 'কোইলী' নামে চালিত [বিজয়চন্দ্র মজুমদার : 'কোকিল' : নব্যভারত : ভাদ্র, ১৩০৮]। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিয়ের সময়ে কনের বাড়িতে 'বারমাসী গান' গাওয়া হয়, যেহেতু কন্যার পিত্রালয় ত্যাগ এক করুণ ঘটনা। অর্থাৎ নারীর বিরহ, বিবাহ এবং প্রসব— সর্বত্রই বারোমাসিয়া গানের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

❐

পরিশিষ্ট : খ'

মন্তব্য : *ষষ্ঠীমঙ্গল প্রসঙ্গে* : এই রচনাটি দ্বিজ নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নামে এক কবির রচনা। সাধারণভাবে যে ভঙ্গিতে এবং যে উদ্দেশ্যে মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে 'মঙ্গলকাব্য' রচিত হত, আলোচ্য রচনাটি তারই ধারক। কাজেই রচনার উদ্দেশ্যের দিক থেকে এর মধ্যে কোনো অভিনবত্ব নেই। জরা রাক্ষসী এখানে কোনো মঙ্গলকাব্যের দেবীতে পরিণত — নিজ পূজা প্রচারের জন্য যিনি সচেষ্ট ও সক্রিয়। তফাতের মধ্যে এই, রাক্ষসী হওয়া সত্ত্বেও তিনি মঙ্গলকাব্যের দেবীর মতো হিংস্র মনোভাবের পরিচয় দেন নি। স্বতোপ্রণোদিত হয়েই সে শুভকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। আসলে নবজাতকের পিতা-মাতা এবং অনুষ্ঠানের আযোজকের নিজ স্বার্থেই রাক্ষসী চরিত্রকে এমন Benevolent করে নেওয়া হয়েছে। যেমন, অসম্পূর্ণ ও বিকৃতাঙ্গ শিশুকে জরা সম্পূর্ণতা ও সুস্থ শরীর দান করেছিলন, এই মুহূর্তের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণেরও ক্ষেত্রে তেমন সৌভাগ্য ঘটবে। কাজেই ভঙ্গি মঙ্গলাকাব্যের হলেও, শেষ পর্যন্ত ব্রত কথার দিকটিই বড়ো হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, কোনো লৌকিক বা আঞ্চলিক কথা বা কাহিনী নয়, মহাভারতের অন্তর্গত একটি Episode-কে এখানে রূপ দেওয়া হয়েছে। কেন এই উপাখানটি নির্বাচিত হল, তার কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথমে কাহিনীটির পটভূমিকা ব্যক্ত করছি। অভিধানে পাই : 'জরাসন্ধ' পদটির অর্থ — জরা কর্তৃক সন্ধা [দেহযোজন] যার, সেই জরাসন্ধ, বহুব্রীহি সমাস। আলোচ্য রচনাটিতে 'জ্বরা' এই বানান লেখা হয়েছে। জরাসন্ধ চন্দ্র বংশীয় একজন রাজা; পিতার নাম বৃহদ্রথ; মাতা— কাশী রাজ্যের দুই কন্যা। জরাসন্ধের রাজ্য হল মগধ, রাজধানী গিরিব্রজপুর। "ঋষিদত্ত আম্র বিভক্ত করিয়া ভক্ষণ করায় ইনি মাতৃদ্বয়ে দ্বিখণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন এবং তদ্রূপে ভূমিষ্ঠ ও পরিত্যক্ত হন। জরা রাক্ষসী খণ্ডিত দেহ সংযোজিত করিয়া বৃহদ্রথকে দান করে। এই হেতু এই শিশুর নাম 'জরাসন্ধ'। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ারম্ভে, গিরিব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে মল্লযুদ্ধে ভীমকর্তৃক ইনি নিহত হন। ইঁহার ভীষণ কারাগারে যে ২০৮০০ শত পরাজিত নৃপতি অবরুদ্ধ ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে মুক্ত করেন। কংসবধ হেতু, ইনি সপ্তদশ বার মথুরা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। কালে যবন মথুরা আক্রমণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার আক্রমণ সম্ভাবনায় দ্বারকার দুর্গে পরিজনগণ সুরক্ষিত করেন [মহাভারত :২, ১৬, ২৪। শ্রীমদ্ভাগবত

১০. ৫০. ৭৩.] এর থেকে জরাসন্ধ কারাগার বোঝাতে 'ভীষণ অবরোধ স্থানমাত্র' বোঝায়।

এই শেষোক্ত অর্থটিই নবজাতকের আত্মীয়বর্গের এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের মূল লক্ষ্য। নবজাতকের আঁতুড় ঘরটি যেন একটি 'ভীষণ অবরোধের স্থান' — যেখানে প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোনো অমঙ্গল, অশুভকারী শক্তি অথবা শত্রুর কোনো অশুভ দৃষ্টি সঞ্চারিত হতে পারবে না। কাজেই এখানে সদৃশ্য-বিধান জাদু [Homoeopathic magic rites]-বোধ ক্রিয়াশীল হয়েছে। তাছাড়া দ্বিখণ্ডিত জরাসন্ধের দেহ যেমন সন্ধিত হয়ে গিয়েছিল। এই প্রকার সদৃশ্য-বিধান জাদুর বলেও, উপস্থিত ক্ষেত্রের শিশুও যদি বিকৃতাঙ্গ রূপে জন্ম নেয়, সেও সুস্থ হয়ে উঠবে — এই আকাঙ্ক্ষা এখানে স্পষ্ট।

কারগারের প্রসঙ্গে এবং রাক্ষসীর অনুষঙ্গে সহজেই এখানে রাজা কংসের কারাগারের দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-প্রসঙ্গটি অস্পষ্ট রূপে ক্রিয়াশীল। আঁতুড়ঘর এখানে যেমন কংসের কারাগার, তেমনি বসুদেব-দেবকীর জীবনের বিপদও উপস্থিত ক্ষেত্রে শিশুর উপর অভিক্ষেপণ করা হয়েছে। জন্মরাতেই শিশুকে পরপারে যশোদার হাতে দিয়ে তাকে বিপন্মুক্ত করা হয়, যেমন কিনা উপস্থিত শিশুর সকল বিপদ কেটে যাবে। কাজেই জন্মকাহিনীটি ব্যক্ত করবার পেছনে দুটি উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। — নি. ভৌ।

ষষ্ঠী মঙ্গল

রূপনারায়ণের দুই তীরবর্তী অঞ্চলে [মেদিনীপুর এর পূর্ব অংশ এবং হাওড়ার পশ্চিম অংশ] এটি গীত হয়ে থাকে।

শ্রীশ্যামল বেরা কর্তৃক সংগৃহীত। টীকা রচনা . নির্মলেন্দু ভৌমিক।

[বন্দনা]

জয় জয় জগৎমাতা জগতানন্দ কারিণী।
প্রসীদ[১] মম কল্যাণ ষষ্ঠীদেবী নমঃস্তুতে॥
বন্দমাতা ষষ্ঠী তুমি পুরাণে মহিমা শুনি
অলঙ্কিত[২] শ্যামল বরণী।
মার্জ্জার বাহন সঙ্গে আসরে উরহ[৩] রঙ্গে
দুগ্ধ শিশুর আপদ নাশিনী॥
সিংহাসনে দুই ধারা মস্তকে সুবর্ণচূড়া
নানারঙ্গে হয়ে সুশোভিতা।
সন্তানে রাখিয়া করে মনোহরা বেশ ধরে
হও তুমি সবার পূজিতা॥
জাত তিনি দিবসেতে বেদ বিধি শাস্ত্রমতে
পূজে যত হয়ে প্রসবিনী।
ত্রিবেদীতে পূজা পেয়ে[৪] বরদাত্রী বর দিয়ে
ক্ষম দোষ তুমি ঠাকুরাণী।
বেদ মতে তিথি ষষ্ঠী জামাতা অরণ্য ষষ্ঠী
পূজে নর মঙ্গল বিধানে।
দ্বিজ নিত্যানন্দে কয় ইহা কভু মিথ্যা নয়
ক্ষমদোষ নিজ কৃপাগুণে॥

---

১. প্রসন্ন হও ; ২. অলঙ্কৃত [?]; ৩. উত্তরহ, অবতীর্ণ হও, অধিষ্ঠান কর
৪. ত্রিবেদবেত্তা ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজিত হয়ে।

[পয়ার]

মগধ দেশের রাজার নাম বৃহদ্রথ[৫] ।
অগণিত সৈন্যগণ রাজ পরিষদ।।
তেজে সূর্য ক্রোধে যম ধনে যক্ষপতি।
রূপে গুণে সর্বসম ক্ষমাগুণে খ্যাতি।।
নিরন্তর যোগ করে অন্য নাহি মন।
দুইকন্যা দান করে কাশীর রাজন।।
পুত্র লাগি যজ্ঞ করেন মহিপাল।
না হইল পুত্র তার গেল যুবাকাল।।
আপনারে ধিৎকার[৬] করে নরপতি।
রাজ্য ত্যজি বনে গেল ভার্যার সংহতি।
বহুদেশ ভ্রমিয়া বনেতে পৌঁছিল।
সেইখানে একমুনি ধ্যান মগ্ন ছিল।।
ভার্যা সহ প্রণমিল মুনির চরণ।
ধ্যান ভঙ্গে জিজ্ঞাসেন কোথায় গমন।।

মুনির নাম গৌতম-পুত্র সদানন্দ; এখানে মুনিবর রাজাকে জিজ্ঞাসা করছেন :

মুনি : হে রাজন, ভার্যাসহ ঘোর বনে আমার নিকট কেন এসেছো বা কোথায় যাবে? কিবা নাম তোমার? কোথায় বাস?

রাজা : মুনিবর, মগধ দেশের অধিপতি আমি। নাম বৃহদ্রথ। আমার এই দুই ভার্যা। আমরা রাজ্য ছেড়ে বনগামী হয়েছি। কি কারণ, শুনুন। কাশীর রাজা তার এই দুই কন্যাকে আমায় দান করেন। দান ধ্যান, পূজা যজ্ঞ যা কিছু সকলি করেছি মুনিবর, যুবা কালই প্রায় আমার কেটে গিয়েছে। এ বয়স পর্যন্ত আমাদের কোন সন্তান মিলিল না। তাই মনদুঃখে রাজ্য ছেড়ে বনগামী হয়েছি মুনিবর।

মুনি : ওঃ সবই বুঝেছি। [মুনি ধ্যানস্থ হলেন। মুনি যেখানে যোগাসনে ছিলেন, সেখানে একটি আম্রবৃক্ষ ছিল। মুনি নয়ন চাওয়ার ফলে মুনির সম্মুখে একটি

---

৫ বৃহৎরথ যার, বহুব্রীহি সমাস; জরাসন্ধের পিতা

৬ ধিক্কার > ধিৎকার দেয়। ইডিয়ম

আম্রফল পতিত হইল।][১]

[পয়ার]

তখন রাজার বিনয় শুনি গৌতম নন্দন।
ধ্যানেতে বসিয়া মুনি চিন্তে ততক্ষণ॥
হেনকালের সম্মুখের আম্রবৃক্ষ হতে।
গাছ হইতে এক আম্র পড়িল ভূমেতে॥
আম্র লয়ে মুনিবর হৃদে বুলাইল।
আনন্দে রাজার করে প্রদান করিল॥

মুনি : [আম্র ফল বক্ষে বুলাইয়া] এই নাও রাজা। এই আম্রফলটি নিয়ে তুমি ভার্যা সহ বাড়ি ফিরে যাও। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ঐ আম্রফলটি যে তোমার প্রধানা স্ত্রী তারেই খেতে দেবে।[২]

---

১. স্পষ্টতই এটি নাট্য-সদৃশ দৃশ্য। মূল গায়ক নিজেই কথক ঠাকুরের মতো একাই সব চরিত্রের অভিনয় করেন। পৌরাণিক, শাস্ত্রীয় আখ্যান এবং মঙ্গলকাব্যের আখ্যানগুলি এভাবেই পরিবেশিত হত। একে নাটকের প্রাথমিক পর্যায় বলা যায়। অতঃপর আসে চরিত্রাভিনেতা। গ্রীক নাটকে প্রথমে থাকত একজন চরিত্র [এবং কোরাস], পরে দুজন, এমনি করে চরিত্রসংখ্যা বাড়তে থাকে। নাটকের উদ্ভবের ক্ষেত্রে এই রীতির তাই একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কখনো বা থাকত কোনো বিশেষ বিষয়ের ভূমিকা রূপে 'ধূয়া', গান — যা 'গীতগোবিন্দে' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ও প্রযুক্ত হয়েছে।

২. সন্তান জন্মানোর জন্য ফল বা শেকড় ভক্ষণ বিশ্বের সর্বত্র অতি পরিচিত একটি Motif। ফল এবং শেকড়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। বৃক্ষের যেমন ফল, নারীর তেমনি সন্তান— এই সাদৃশ্য জাদুবোধ এখানে ক্রিয়াশীল। কিন্তু শেকড়ের কোনো ভেষজ গুণ থাকা সম্ভব। এইখানে Herbal Medicine এবং আয়ুর্বেদের তফাৎ লক্ষণীয়। Herbal Medicine কেবল গাছ-গাছড়ার পাতা; আয়ুর্বেদ পাতা-শেকড় সহ পুরো গাছটিকেই ভিত্তি করে।

[পয়ার]

তখন মুনিরে প্রণাম করি নিজালয়ে গেল
ফল লয়ে দুই ভার্যায় গমনে বাঁচিল ॥
নিত্যানন্দ বলে যত ষষ্ঠীদেবীর মায়া।
করগো করুণাময়ী দেশবর্গে[১] দিয়া ॥

রাজা : এই নাও রানী। তোমরা আমার দুই ভার্যা— তোমরা সমভাগে এই ফলটি খেয়ে নাও। [দুই রানীকে ফল প্রদান করিল [২]]

[পয়ার]

দুই জায়ায় সমভাগে ফল বাঁটি দিল।
দুই ভগিনী সমভাগেতে খাইল ॥
এইরূপে কিছুদিন হইল যাপন।
এককালে গর্ভবতী হৈল দুইজন ॥
এককালে কালপূর্ণ হইল যখন।
একত্রে প্রসব দোঁহে[৩] হইল তখন ॥
দুই রানী একদিন পুত্রলাভ কৈল।
অর্ধ অর্ধ পুত্র দোঁহাকার হৈল ॥
এক চক্ষু নাশা কর্ণ এক পদ কর।
অর্ধ অর্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় অন্তর ॥
নৈরাস[৪] হৈয়া রাজা ঘৃণা করি মনে।
ফেলাইয়া দিতে আজ্ঞা দিল দাসীগণে।

---

১. আত্মীয়বর্গে [?]

২. মূল গায়ক কথকের ভূমিকায় যখন অভিনয় করেন, তখন এই সব অংশের প্রত্যক্ষ অভিনয় না করে মূকাভিনয় করে থাকেন। পুতুল-নাট্য থেকেই যদি ভারতীয় নাট্যের উদ্ভব হয়ে থাকে, তবে পুতুলের মূকাভিনয় থেকেই মানুষের অভিনয়ে প্রাথমিক যুগে মূকাভিনয় এসে গিয়েছিল।

৩. দুজনের— দোঁহাকার, দুজনের

৪. 'নিরাশ' শব্দের কাব্যিক রূপ।

রাজা : ওগো দাসী, এ পুত্রের আমাদের আর দরকার নেই। এ অর্ধ অর্ধ পুত্রকে ঐ নদীর জলে ফেলে দিয়ে এসো [১]।

দাসী : আচ্ছা মহারাজ — তাই' যাচ্ছি —

[পয়ার]

অর্ধ অর্ধ সন্তান লয়ে দাসীগণ।
নদীর তীরেতে গিয়া ফেলিল তখন॥
জুরা নামে রাক্ষসী আসিল তথায়[২]।
অর্ধ অর্ধ সন্তানে দেখিবারে পায়॥
আপন নয়নে ইহা কখনো না দেখে।
দুই হস্তে দুইখান তুলিয়া নিরখে [৩]॥

রাক্ষসী জুরা : আরে, কি ব্যাপার বলোতো— কে এমন আধখান আধখানা ছেলেকে এমনভাবে নদীতীরে ফেলে দিয়ে গেছে। কি ব্যাপার— ওঃ জেনেছি — বৃহদ্রথ রাজার দুই রানী এই অর্ধ অর্ধ ছেলে প্রসব করেছে। তাই ঘৃণা করে নদীতীরে ফেলে দিয়ে গেছে। ছেলে দুটো তো মরে নি।[৪] জীবিত দেখছি। [অর্ধ অর্ধ সন্তানে দুই হস্তে ধরিয়া একত্র করিল] বাঃ বাঃ আচ্ছা হলো তো। দুই হস্তে জোড়াদিতে অর্ধেক অর্ধেক ছেলে এক হয়ে গেল[৫]। বাঃ চমৎকার। যাইহোক, আমি এখন এ ছেলেটায় নিয়ে কি করি? আমি তো রাক্ষসী— আহার সন্ধানে, নদীতীরে এসেছিলাম। যদি এই ছেলেটায় আহার করি, আমার পেটও ভরবে

---

১. সদ্য প্রসূত সন্তানকে পরিত্যাগ — এই Motif বিশ্বের এক পুরাতন Motif। সর্বত্রই এই সন্তান আশ্রিত হয় এবং নায়ক হয়।

২. জুরা নাম্নী রাক্ষসীর দ্বারা 'সন্ধিত' অর্থাৎ যুক্ত বলেই নাম হয়— 'জরাসন্ধ'।

৩. নিরীক্ষণ করে, নামধাতু।

৪. মরে নি। ঔপভাষিক প্রয়োগ।

৫. অনেক প্রসূতির বিকৃত সন্তান জন্মায়। ভবিষ্যতে একদিন দৈবানুগ্রহে সেই বিকৃতি ঘুচে যাবে, এ আখ্যানের উপস্থাপনার পেছনে সে কারণও থাকা সম্ভব। রাক্ষসী এখানে কোনো Malevolent চরিত্র না হয়ে মঙ্গলকামী Benevolent চরিত্রে পরিণত। আঁতুড় ঘরে যাতে কোন অশুভ ঘটনা না ঘটে সেই জন্য রাক্ষসীকে Appease করা।

না। তার চেয়ে এক কাজ করি— আমি রাজার কাছে নিয়ে যাই। রাজা অর্ধেক অর্ধেক ছেলে বলে ঘৃণা করে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। এখন তো জোড়া হয়ে গিয়েছে। রাজাকে যদি এই ছেলেকে নিয়ে গিয়ে দিই— রাজা খুবই আনন্দ পাবে। আর আমারও পূজার প্রচার হবে।

[পয়ার] [১]

তখন মানুষের বেশ ধরি জুরা নিশাচরী।
রাজার নিকটে গেল পুত্র কোলে করি॥

রাক্ষসী জুরা : মহারাজ, নদীতীরে আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, অর্ধেক অর্ধেক ছেলে নদীতীরে পড়ে আছে। আমি জীবিত দেখে দুই হাতে তুলে একত্র করতে জোড়া হয়ে গিয়েছে।[২] এই দেখুন মহারাজ সুন্দর ছেলে। আপনি মনের দুঃখে ফেলে দিয়েছিলেন। আমি জোড়া করে আপনায়[৩] দিতে এসেছি। এই নিন মহারাজ — [পুত্র রাজার হস্তে দিল[৪]]

রাজা : সবই তো শুনলাম। তবে তুমি কে? তোমার পরিচয় দাও আমায়[৫]।

রাক্ষসী জুরা : তবে শোন রাজা পরিচয় মোর।
দানব বিনাশে মোর হৈল সৃজন।
সর্ব গৃহে থাকি আমি করহ শ্রবণ॥
তোমার নিকটে পূজা লইবার আশে।
তাই রক্ষা করি আনিলাম পুত্রে তব পাশে॥[৬]

---

১. এই 'পয়ার' থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, মূল গায়েন পূর্ব ও পরের ঘটনার সংযোগ সাধন করছেন। তুলনীয়, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র 'দণ্ডক'। ড. সুকুমার সেনের মতে 'দণ্ডক' হল, 'বর্ণনাত্মক [descriptive] বা বিবৃতিময় [narrative] গান।'

২. রাক্ষসীর মধ্যে শুভঙ্কর জাদুশক্তি আছে বলেই এই ধরনের অনুষ্ঠান করা হয়।

৩. আপনাকে; দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ মধ্যযুগে ছিল। এখনও আছে।

৪. মূল গায়েন কথক রূপে নিজে দেবার মূকাভিনয় করেন।

৫. আমাকে। দ্বিতীয়ার অর্থে সপ্তমীর প্রয়োগ।

৬. সব ব্রত-পূজা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য সর্বত্র এক ও অভিন্ন।

নাম আমার জ্বরা রাক্ষসী। নদীতীরে আহার সন্ধানে বিচরণ করিতেছিলাম।[১] তোমার পুত্রে না আহার করে আমি ফিরে দিয়ে গেলাম। মহারাজ এই ছেলের ষষ্ঠীবাসর করে[২] আমার পূজার আয়োজন কর। তোমা হতে জগতে আমার পূজার প্রচার হবে।

রাজা : তাই হবে মাতা। তোমার নাম জ্বরা। তুমি আমার অর্ধ ছেলেকে দুইকে জোড়া দিয়ে বাঁচিয়েছ। ব্রাহ্মণগণে ডেকে তোমার সন্ধিত হেতু[৩] আমার পুত্রের নাম জ্বরাসন্ধ নামকরণ করবো। আর ষষ্ঠীবাসরে পূজার আয়োজন করবো।

[পয়ার]

এত বলি জ্বরা রাক্ষসী চলে নিজস্থানে।
পুত্র লয়ে নরপতি মহা হর্ষবান[৪] ॥
পুতের নাম রাখিলেন ডাকি দ্বিজগণ।
জ্বরার সন্ধিত হেতু জ্বরাসন্ধ নাম ॥
আনন্দেতে কৈল ষষ্ঠী পূজার আয়োজন।
বিধি মত আয়োজন কৈল দ্বিজগণ ॥
নিত্যানন্দ বলে যত ষষ্ঠীদেবীর মায়া।
করগো করুণাময়ী দেলবর্গে দয়া ॥
রাজা প্রজায় পুজে ষষ্ঠীর চরণ।
শঙ্খ ঘন্টা হুলাহুলি[৫] বিবিধ বাজন ॥

---

১. বক্তব্য emotive হতেই ভাষায় সাধুরীতির প্রভাব এসে গেছে। বক্তব্য ভাবগভীর হতেই ভাষাও ভাবগভীর হয়,— এই জন্যেই সাধুরীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। Stylistics— এর দিক থেকে প্রয়োগটি উল্লেখযোগ্য।

২. জন্মের ষষ্ঠ দিবসের কৃত্য পালন করে।

৩. 'সন্ধিত' হেতু।

৪. হর্ষযুক্ত

৫. আনন্দ ধ্বনি। পুরুষগণ মুখ হা করে তর্জনী ঢুকিয়ে, সঘন নেড়ে, উচ্চ চিৎকার করত। পরবর্তীকালে স্ত্রীলোকগণ জিহ্বা দ্বারা তা করে থাকে। পূর্ববঙ্গে বলে 'জোকার', 'জোগার' [< জয়কার]।

পরিশিষ্ট : 'গ'

শিশুচারণার পক্ষে লোকাচার

১. আগেকার দিনে শিশুকে কারো সঙ্গে হাঁটাপথে কোথাও পাঠাতে হলে ঐ শিশুর পকেটে নাগদানা গাছের পাতা ঢুকিয়ে দিত মা। ***বিশ্বাস,*** হাওয়া-বাতাস বা ভূত-প্রেতের হাত থেকে শিশু রক্ষা পাবে।

২. কোথাও পাঠাবার কালে মা তার শিশুর কড়ে আঙুল কামড়ায়। কিংবা শিশুকে ছেড়ে মা সাময়িক কোথাও যাবার কালে শিশুর হাতের কড়ে অঙুল কামড়ায়। ***বিশ্বাস,*** মায়া থাকবে না।

৩. শিশুর কপালে কাজলের ফোঁটা দিয়ে তার রগে ও পায়ের তলায় কাজলের ফোঁটা দিয়ে দেওয়া হয়। ***বিশ্বাস,*** তাতে নাকি কারো কুদৃষ্টি পড়ে না।

৪. বাচ্চাদের মাসিপিসি হাম জাতীয় অসুখ হলে মাসি বা পিসির কাপড়ে কাঁথা করে শোয়ালে বাচ্চার ঐ রোগ সারে। কখনো বা গোয়াল ঘরে গড়াগড়ি দেওয়ানো হয়। গোরচনায় তা নাকি সারে।

৫. এক শিশু অন্য শিশুকে পাটকাঠি দিয়ে মারলে মা নিষেধ করে। যাকে মারা হয়, তার নাকি অসুখ বা জ্বর হয়।

৬. শিশুদের মাথায় মারতে নেই, বিছানায় রাতে পেচ্ছাপ করে ফেলে।

৭. বাচ্চাদের হাম হলে তিনটি ফুলপাতা তুলে এনে উনুনপাড়ে দিলে, কুলপাতাও শুকুবে —হামও শুকোবে।

৮. চান করে গর্ভবতীদের প্রথমে পরিষ্কার বা সাদা জিনিস দেখাতে হয়। কালো জিনিস দেখালে বাচ্চা কালো হয়, ফর্সায় ফর্সা।

৯. গর্ভবতীর বাম হাতের তালু লাল হলে বাচ্চা ফর্সা হয়।

১০. গর্ভবতী যা যা খেতে চায় তা তা না খেতে পারলে বাচ্চার [জন্মের পর] বেশ কবছর মুখ দিয়ে লালা পড়ে।

১১. আগুন নিয়ে শিশু যদি খেলা করে রাতে বিছানায় পেচ্ছাপ করে।

১২. বাচ্চা-কাচ্চা হলে আঁতুড়ে মা যদি ভাত খায়, খেতে খেতে যদি ভাত পড়ে যায়, তুলে না খেলে বাচ্চার মাসিপিসি হয়।

১৩. শিশু যদি কারো গা ছুয়ে মিথ্যা কথা বলে, তবে ঐ শিশুর মায়ের মৃত্যু হয়।

১৪. শিশু বাড়ির বাইরে গেলে মা তার মাথায় থুথু [তিনবার] দিয়ে দেয়, অশুভ আত্মার থেকে রেহাই পেতে।

১৫. যে মায়ের একটিমাত্র শিশু বজ্রবিদ্যুৎকালে উঠানে সেই শিশু যদি ঘরের পিঁড়ি উল্টো করে দিয়ে আসে তবে বজ্র-বিদ্যুৎ-ঝড়-বৃষ্টি থামবে।

১৬. শিশুরা খেলতে খেলতে এ ওর মাথা দেখে। বলে মাথায় দুটো টিকি থাকলে দুটো বিয়ে হয়।

১৭. মাথায় দুটো তিল থাকলে দুটো বিয়ে।

১৮. ঘুরে ঘুরে খাওয়ালে বাচ্চাদের গায়ে হাওয়া-বাতাস লাগে।

১৯. কোন শিশু দুটো ঝাঁটাকাটি একত্রে বাজালে মা-মাসিরা নিষেধ করে, নইলে বাড়িতে নাকি ঝগড়া বাঁধে। ['নারদ নারদ ঝাঁটা কাঠি / যা লেগে যা ঝটাপটি']

২০. অনেক শিশু বুকে থুতু দিয়ে বাগানে যায়, তাতে নাকি ভূতে ধরে না।

২১. সন্ধ্যাপ্রদীপ থেকে পাটকাঠি জ্বেলে শিশু যদি খেলে তো রাতে বিছানায় প্রস্রাব করে।

২২. শিশুরা বলাবলি করে— কোথাও গিয়ে ভয় পেলে নিজেকে কেন্দ্র করে বৃত্তকারে প্রস্রাব করে দাঁড়িয়ে থাকলে ভূতে ধরতে পারে না।

২৩. প্রথম পিঠেটি কারো খেতে নেই। বাড়ির ছেলেমেয়েরা যদি খায় তবে ঐ চেলেমেয়েদের প্রথম সন্তান কন্যা সন্তান হতে পারে।

২৪. জন্মদিনে বেগুনপোড়া খেতে নেই।

২৫. টিকটিকির ডিম ফাটালে [শিশুর] , পেট ব্যথা করে।

২৬. মাথায় মাথায় ঘা লাগলে শিশুরা বলে, এক ঠুল দিতে নেই। তাই আস্তে করে আর একটা ঠুল দেয়।

২৭. ঠ্যাং ছড়িয়ে ভাত খেলে শিশুদের সংস্কার— অনেক দূরে বিয়ে হয়, তাই ঠ্যাং গুটিয়ে নেয়।

২৮. একটানা বৃষ্টির পর রোদ উঠেই আবার মেঘ করেছে। তখন কোনো শিশু উঠোনে পড়ে গিয়ে যদি হেসে ফেলে, ***বিশ্বাস,*** মেঘ যাবে, রোদ হবে।

২৯. একটা কলা আর দুটো ডিম খেয়ে পরীক্ষা দিতে গেলে সে নাকি পরীক্ষায় ১০০ নম্বর পায়।

৩০. পয়সা-টাকা হাতে নিয়ে প্রসাব বা পায়খানা করতে নেই।

৩১. শিশুরা বলে— নিজের ছায়া নিজে দেখতে নেই—অশুভ আত্মায় ভর করে।

৩২. হাতের জল কারো গায়ে ছিটাতে নেই, নখ পচে যায় [যে জল ছিটায়]।

৩৩. মা যদি উত্তরমুখো শোয়ে, তবে সন্তান নাকি মরে যায় [গণেশের ঘটনা মনে পড়ায়]।

৩৪. শিশুরা বলে, মার নাম ধরতে নেই।

৩৫. ভাত ডিঙোতে নেই, মুখে গোটা হয়।

৩৬. শিশুর চানপাত্রের জলে তেল-দূর্বা-তুলসীপাতা দিতে হয়।

৩৭. মরা দেখলে নমস্কার বা প্রণাম করতে হয়।

৩৮. শবযাত্রার পয়সা পথ থেকে কুড়িয়ে বাচ্চার কোমরে দিলে অশুভ আত্মা তাকে ছোঁয় না।

৩৯. সরস্বতী পূজোর আগে শিশুদের বিশ্বাস কুল খেলে বিদ্যা হয় না।

৪০. ছেলের জন্মবারে ঝাঁটা বাঁধলে, ছেলের অমঙ্গল।

৪১. খেতে বসে জামায় এঁটো লাগলে বলে শিশুরা রাতে স্বপ্ন দেখে, ফলে

প্রস্রাব করে ফেলে বিছানায়।

৪২. পা দিয়ে শোওয়ার বিছানা টানতে নেই।

৪৩. কারো মাথায় খড়কুটো থাকলে জানাতে হয়।

৪৪. বাচ্চারা গুঁড়ি পিঁপড়ে খেলে নাকি ভাল সাঁতার শেখে।

৪৫. আগুন নিয়ে খেলা করলে নাকি মামার বুক পুড়ে যায়!

৪৬. তারাখসা দেখলে ৭টি ফুল, ৭টি পুকুর ও ৭টি গাছের নাম করতে হয়।

৪৭. এক চোখে দেখতে নেই, ঝগড়া হয়।

৪৮. কাপড় শুকাতে দিলে তলা দিয়ে যেতে নেই।

৪৯. সরস্বতী পূজার দিন বই পড়লে বিদ্যা হয় না।

৫০. ঢেঁকিতে বসলে ১২ বছর অযাত্রা।

৫১. মাথায় মারলে ফুঁ দিতে হয়। নইলে বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে রাতের ঘুমে।

৫২. গ্রীষ্মের দুপুরে শিশুরা মাঠে গেলে ভূতে ধরে।

৫৩. দুপুরে শিশুদের গাছে ওঠায় মানা, তাতে নাকি ভূতে ধরে।

৫৪. রাতে বাগানের গাছে পেঁচা ডাকলে উনুনে লোহার শিক পোড়াতে হয়, তাহলে সন্তানের কোনো অমঙ্গল হয় না—মায়ের বিশ্বাস।

৫৫. প্রজাপতি ধরলে বিয়ে হয় না।

৫৬. ঘুঁটে দিয়ে মারলে গায়ে ঘুঁটে হয়।

সংগ্রাহক : ড. শ্যামপদ মন্ডল। গ্রাম ও ডাকঘর : নগরউখড়া জেলা : নদীয়া।

পুনশ্চ

সন্তানের জন্য কামনা, সন্তানের জন্মের পর নানা কৃত্য ইত্যাদি প্রসঙ্গকে নিম্নলিখিত কয়েকটি দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে :

১. সন্তানের জন্য সবার কামনা-প্রার্থনা, বিভিন্ন দেবতা উপদেবতার কাছে 'মানত' করে;
২. সন্তান লাভের জন্য নানা প্রকার আভিনয়িক অভিচার পালন;
৩. সন্তানের জন্মের পর ছয়, সাত, একুশ বা ত্রিশদিন পরে অনুষ্ঠেয় কৃত্যাদি;
৪. বিভিন্ন আদিবাসী সমাজ সন্তানের জন্মের পর পিতার ভূমিকা;
৫. নবজাতকের নামকরণ।
৬. শিশুবলি, শিশু উৎসব।

একে একে প্রসঙ্গগুলি আলোচনা করছি এবং সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১.

ড. পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য তাঁর 'লোকসংস্কৃতির আলোকে' [আগস্ট, ১৯৯৩] বইতে জানাচ্ছেন [পৃ. ৩৯] , হাওড়া জেলাতে বৈশাখী বা বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন ধর্মঠাকুরের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই স্নানযাত্রার উদ্দেশ্য হল, ভূমিতে জল সেচন করে ভূমির উর্বরতা বিধান এবং তা 'বন্ধ্যানারীর উর্বরতা বৃদ্ধিতে transformed হয়েছে। পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে নিঃসন্তান ব্যক্তির 'গাজীর গীত' মানত করবার প্রথা ছিল। ড. মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য 'নিরক্ষর কবি' [ভারতবর্ষ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। পৃ. ৯৬২-৯৬৭] প্রবন্ধে লিখেছেন, 'এই গীত [গাজীর গীত] কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে হইয়া থাকে কি না জানি না, তবে শুনিয়াছি, যে সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভদ্রলোক নিঃসন্তান হয়, তাঁহারা নাকি পুত্রধনে ধনী হইবার জন্য গাজীর গীত মানত করিয়া থাকেন; কেননা প্রবাদ আছে যে, গাজি কালু ফকিরের আশীর্বাদে এক অপুত্রক বাদশাহের পুত্র হইয়াছিল।' রাজা-বাদশাহ্দের নিঃসন্তান থাকা এবং সে জন্য নানা প্রকার অনুষ্ঠানাদি করা একটি বিশেষ Motif। ভারতের এক উপজাতি খন্দদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, 'উষাপেনু' মাসে দেবতার পূজো করলে পুত্রলাভ হয় [তারকচন্দ্র রায় : ভারতী : ভাদ্র, ১৩১৭। পৃ. ৩৬৬-৩৭৩] । [সৌরভ : অগ্রহায়ণ,

১৩৩০। সঙ্কলন : ভারতী পৌষ, ১৩৩০। পৃ. ৮৭৪-৮৭৬] প্রবন্ধে বলেছেন, মৈমনসিংহ জেলার স্ত্রীলোকেরা নারীর 'গর্ভাধানকালে' যে সব গান গেয়ে থাকেন, তার মধ্যে অশ্লীলতার ছোঁয়া থাকে। বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলেই সন্তানের জন্য 'মানত' করে দেবস্থানের সন্নিহিত বৃক্ষাদিতে, 'ঢেলা' বাঁধবার প্রথা আছে। মানত অনুসারে সন্তান জন্মালে ওই 'ঢেলা'র বাঁধন খুলে নেওয়া হয়। এবং প্রতিশ্রুত পূজা 'শোধ' করা হয়। দেবতার কাছে 'মেগে' যে সন্তানের জন্ম হয়, পূর্ববঙ্গে তার নামকরণ করা হয় 'মাগন' [মাগ্ + অন। তুলনীয় 'মাগন ঠাকুর' নাম] । আসলে, পূজা প্রসাদের মধ্যে যে ফুল-ফল থাকে, তা অনেক সময় বন্ধ্যাত্ব ঘোচাতে সাহায্য করে। অনেক সময় শিশুর অলৌকিক আবির্ভাবের সূচক রূপে কোনো প্রাকৃত নৈসর্গিক ঘটনা ঘটে। যেমন, যিশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে বেথলেহেমে যে এক বিশিষ্ট নক্ষত্রের উদয় হয়, বিশ্বাস, তা তিনশত বছর পর পর দেখা দেয়। এটি christlore-এর বিশেষ দিক।

২.

'মানতে'র সঙ্গে সঙ্গে নানা আভিনায়িক ও আভিচারিক দিকও উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের বিবাহাচারের একটি দিক। এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। মুসলমানদের বিবাহের ঠিক পরদিনই অনুষ্ঠিত হয় 'বাসি গোসাল', অর্থাৎ বর-কনেকে স্নান করানো। হাবিবুর রহমান তাঁর 'বাংলা দেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ' [বাংলা একাডেমী, ঢাকা। জুন, ১৯৮২] বইতে এ বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন [পৃ. ৯০-৯১], তা এই : 'বাসী গোসাল বধূ-সংক্রান্ত আচার। আচারটি বরের বাড়িতে বাসর জাগার পরের দিন সম্পন্ন হয়। এই উৎসব সন্তান কামনামূলক। তাই এতে নবজাতকের ক্রন্দনের অভিনয় করে সঙ্গীত পরিবেশিত হয় :

ছাওয়াল কান্দে রে চাচীর কোলে খাইতে ছাওয়াল কান্দে রে।
দাদীর কোলে খাইতে ছাওয়াল ছল্‌বল্ ছলবল্ করে রে।
খল্‌বল্-খল্‌বল্ করে রে।।

'সঙ্গীতটি জাদু বিদ্যা সংক্রান্ত। বিশ্বাস করা হয় যে, সন্তান-ক্রন্দনের অভিনয়-গীতির ফলে সন্তানের আবির্ভাব ত্বরান্বিত হবে।' কিন্তু সেই সঙ্গে আরো দুটি কথাও যোগ করা যেতে পারে : প্রথমত, কৃত্যটি বরের গৃহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে;

দ্বিতীয়ত, এই স্নান-জল বরের ঔরসের প্রতীক। এ বিষয়ে ধর্মঠাকুরের স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান তুলনীয়।

মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার হিন্দু রমণীগণ যে কার্তিক ব্রতানুষ্ঠান করে, তাতে দেখা যায়, ব্রতিনীর সন্তান কার্তিক রঙ হবে [এই সব সন্তানের নামও তাই 'কার্তিক', হয়ে থাকে, যেহেতু কার্তিক সন্তানেরও দেবতা। 'কুমারসম্ভব' অর্থাৎ কার্তিকের জন্মকথা নিয়েও ভারতীয় পুরাণে নানা আখ্যান দেখা যায়], এই বিশ্বাস সেখানে ক্রিয়াশীল। 'ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার গ্রাম্যসঙ্গীত' [সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩৩৫, ৩য় সংখ্যা। পৃ. ১৬৮-১৭০] প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, অন্তপুরবাসিগণ কার্তিক পুজা উপলক্ষ্যে এই গান গেয়ে থাকেন :

বুলেরে,[১] কার্তিক জাইবান[২] শশুর বাড়ী[৩]
আল্লুয়া চাইলে খেঁসারির ডাইলে সঞ্জম বালা,[৪]
কিশোরগঞ্জের বাজারের কাজ মরুবে, / মুলাই-বাইংগনে সন্ত্রাস বালা,
বুলে রে, এক পুতের মা ঐইয়া[৫] /গো দুইয়পুত্রের মা ঐইব[৬]
বুলে রে. য্যাংরাজের রাজা আমার শামের ঔকে[৭]
বুলে রে, আমার শামের হাতে ঔক সোনার ঘড়ি
বুলে রে, ছায়লানরে ছায়লানরে[৮] কার্তিক যাইবাইন শ্বশুরবাড়ি ।।

[নি. ভৌমিক কর্তৃক টীকা : ১. 'বলে রে'—গানের 'ধুয়া' রূপে ব্যবহৃত, মূলত অব্যয় রূপে প্রযুক্ত। ২. কার্তিক খাবেন; 'কার্তিক' একদিকে সন্তান, অপরদিকে দেবতারও নাম। সেই কারণে সাম্মানিক পদের প্রয়োগ ঘটেছে। ৩. 'কার্তিক' নামধেয় পুত্র শ্বশুরবাড়ি যাবে—ছড়ায় শিশুর বিবাহিত জীবনের কথা থাকে, এখানে তা স্মরণীয়। ৪. ব্রত উদ্‌যাপনের পূর্বদিন 'সংযম' [ভুল উচ্চারণে 'সঞ্জম'] পালন করতে হয়, 'বালা' অর্থাৎ ব্রতিনীকে। এ জন্যে সেদিন নিরামিষ খাদ্য [আলোচাল, খেসারিডাল, মুলো-বেগুন] গ্রহণ করতে হয়। ৫. এক পুত্রের মা হয়ে পরে দ্বিতীয় পুত্রের মা হব। ৬. হইব, হব। ৭. হউক। ইংরেজের রাজত্বে আমার শ্যাম-রূপী পুত্র রাজা হোক। শামের ঔক = শ্যাম হোক। ৮. ছায়ায়-ছায়ায় রে [?]। কার্তিকের আশীর্বাদে কার্তিক এবং শ্যামরূপী আমার পুত্র সোনার ঘড়ি হাতে পরে ছায়ায়-ছায়ায় শ্বশুর বাড়ি যাবে—মায়ের এই সাধের কল্পনা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। কেবল

প্রথম পুত্রের বেলাতেই নয়, পরবর্তী দ্বিতীয় পুত্রের বেলাতেও যেন তা ঘটে। একাধিক পুত্র-কামনা একদা সমগ্র পরিবারেরই কাম্য ছিল। যতো অধিক সংখ্যায় পুত্র জন্মাবে ততো বেশি পরিমাণে কৃষিকর্মের বিস্তার ঘটবে।]

৩.

সন্তানের জন্মের ছয়, সাত, একুশ বা ত্রিশ দিনের পরে এক বিশেষ অনুষ্ঠান করা হয়। নানা অঞ্চলে এই অনুষ্ঠানের নানা নাম, অনুষ্ঠানেরও বৈচিত্র্য আছে। মূলত এটি ছ-দিনের পর বা সেই রাত্রিতে অনুষ্ঠেয়। একেই বলে 'ষাইট্যারা' [< ষষ্ঠী + ইক + আরা] >পূর্ববঙ্গে 'হাইট্যারা',। শিশুর জন্মের পর আনন্দে পাড়া-পড়শীকে পান-সুপুরি-তেল দিয়ে আপ্যায়ন করবার প্রথা আছে ফরিদপুর জেলাতে। সেখানে একে বলে 'ত্যাল-পান' গুয়ার গান'। মোহম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত, ঢাকার বাংলা একেডেমী থেকে প্রকাশিত 'লোকসাহিত্য'/আনুষ্ঠানিক লোকগীতি' [সপ্তম খণ্ড]; জুলাই ১৯৬১] বইতে এ-বিষয়ে আলোচনা সহ উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। নিচে আমাদের মন্তব্যসহ তা উদ্ধৃত করলাম :

বলা হয়েছে, রংপুর জেলার মুখেভাত অনুষ্ঠানের নাম 'সাইটোর', [আমাদের মতে—'ষাইটোর']। এম. কাইউম 'হাইট্যারা'র যে বিবরণ দিয়েছেন, তা এই :

> 'অনুষ্ঠানের পূর্বরাত্রিতে সন্তানকে বিদ্বান করার মানসে একটি দোয়াত ও কলম নব-জাতকের শিয়রে রেখে দেওয়া হয়। পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়া শ্রেণীর মেয়েরা সারারাত ব্যাপী প্রসূতির ঘরে ঠাট্টা, আমোদ ও গীত-উৎসবে মগ্ন হয়। পরদিন তারা প্রথমে প্রসূতি ও নবজাতককে গোসল করায়। তারপর বাড়ীঘর নিকিয়ে-মুছে, কাপড়-চোপড় ধুয়ে পাক-পবিত্র করবার কাজে সবাই মেতে ওঠে। সেদিন শুচিস্নানের পর নব-জাতক ও তার মাকে নতুন বস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। বাড়ীর উঠোনে একটি মাদুর-চাটাইয়ের উপর কিছু ধান মেলে দেওয়া হয়।'

'প্রসূতি নবজাতককে কোলে নিয়ে হাতে একটি পাত্র বা 'লোরা' নিয়ে [আমাদের মতে লোটা < লোড়া < লোরা], নিয়ে ঘর থেকে বেরোয়। সে লোরার অভ্যন্তরে কাঠ কয়লা সর্ষে [আমাদের মতে এগুলি অমঙ্গল প্রতিরোধক দ্রব্য], ইত্যাদি থাকে। সে সময়ে ঘরের সামনে দু-জন স্ত্রীলোক শিশুসন্তান ও মায়ের মাথার উপর একটি কাপড় মেলে ধরে। পরিবারের আর একজন রমণী আসে

ঘটের পানি নিয়ে। সে ঘটের পানিতে আমপাতা ডুবানো হয় এবং শিখা-পাটা ধোয়া পয়ানি মিশ্রিত, থাকে [পশ্চিমবঙ্গের শিল-নোড়া, পূর্ববঙ্গে শিল-পাটা'।] শিল-নোড়া বিবাহ ও ষষ্ঠী পূজাতে পশ্চিমবঙ্গেও ব্যবহৃত হয়। শিল-নোড়া ধোয়া জল শিশুকে প্রস্তরবৎ দৃঢ় করবে। বাড়িতে হাম-বসন্ত ইত্যাদি রোগ দেখা দিলে, অনেকের বিশ্বাস শিল-নোড়ার 'চোখ ওঠে'। এ কারণেও শিল-নোড়ার ব্যবহার হতে পারে। এই পানি ছিটান হয় শিশু ও মায়ের মাথার উপর মেলে ধরা সেই কাপড়ের উপর [অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশটি পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই বোঝা যায়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গোপন আবরণ—অশ্বমেধ যজ্ঞকালে রানীরা একটি বস্ত্রের আবরণে একটি ঘোড়ার সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকতেন। আমপাতা ধোয়াজল স্পষ্টতই স্বামীর ঔরসের প্রতীক। ওপরে যে কটি সন্তান কামনার দৃষ্টান্ত দিয়েছি, সব কটিতেই তাই স্নান বা জল ঢালার কৃত্যটি অপরিহার্য ভাবে আছে]। ঠিক এ সময় একজন প্রশ্ন করে এবং তার একজন তার উত্তর দেয় [এই ধরণের প্রশ্ন-উত্তরের কৃত্যটি, আশ্বিন সংক্রান্তির দিন, ধান গাছের 'সাধ' প্রদানের পর কৃষকেরাও পালন করে] :

প্রশ্ন—ডাইল মিড়ুরী[১] খাইছ গো?
উত্তর—ডাইল মিড়ুরী খাইছি গো।
প্রশ্ন—এক ছেঁড়া [ছেলে] ডেটে কইরা[২]?
উত্তর—সাত ছেঁড়া অওক[৩]।

উপস্থিত সকলেই তখন সমবেত ভাবে বলে অওক, অওক, অওক[৪]।

[নি. ভৌমিক কর্তৃক টীকা : ১. 'মিঠুরী', মিঠাই। স্পষ্টতই নিরামিষ ভোজনের ইঙ্গিত। ২. 'ডেনাতে' অর্থাৎ বাহুতে সন্তানকে ধারণ করে। ৩. হোক। ৪. তিনবার সমবেত নারীর উচ্চারণ একদিকে জাদুবোধক, অপর দিকে পারিবারিক দিক থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত। [লক্ষণীয়, সন্তানের জননী নিজেই বহু সন্তান চাইছে।] এই ধরনের প্রশ্ন-উত্তর এবং অভিনয়গুলিই লোকনাট্যের নিতান্ত প্রাথমিক দিক। নাটকের উদ্ভব সম্পর্কে যে বলা হয় Dramatic ritual > Ritual drama, এই সব তথ্য থেকে তা স্পষ্ট হয়]

'এ অনুষ্ঠানের পর 'লোরা' ও শিশুসহ প্রসূতি ধান মেলে দেওয়া চাটাইয়ের কাছে যায়। তখন অন্যেরা একটি বড় থালায় বা কুলায়ে পান-সুপারি ধান-দূর্বা ইত্যাদি সাজিয়ে প্রথমে চাটাই-এর পূর্ব দিকে রাখে। প্রসূতি শিশুসহ সেদিকে

গিয়ে সালাম করে এবং এভাবে উত্তর ও পশ্চিম দিকেও সালাম জানায়। কিন্তু দক্ষিণ দিকে সমুদ্র বলে সেদিকে প্রসূতি সালাম করে না [সমগ্র অনুষ্ঠানটি এবং তার উপচারগুলি বিশ্লেষণ করলে দুটি কথা মনে হবেই : এক. এটি একটি কৃষি-অনুষ্ঠান; দুই. মূলত এটি হিন্দু-সংস্কৃতি থেকে মুসলিম সংস্কৃতিতে গৃহীত। শিশুকে নিয়ে প্রসূতি মেলে-দেওয়া ধান নাড়া-চাড়া করে, বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যে সেই ধানকে শিশু যেন জীবনের প্রথমেই আজ বরণ করে নিল, একজন কৃষকের সন্তানরূপে এবং তার ভবিষ্যতের জীবিকা রূপে। পূর্বদিকে সর্বাগ্রে প্রণাম [সালাম] করবার অর্থ, কৃষিকর্মের মূল উৎস সূর্যকে প্রণাম। দক্ষিণ দিকে প্রণাম না করবার হেতু মূলত দক্ষিণ দিকে যমের দুয়ার অবস্থিত, এবং শিশুকে তার আয়ুষ্কামনায় অবশ্যই সেদিন সেদিকে দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করা হয়]।

'এরপর প্রসূতি নবজাতককে কোলে নিয়ে মাথার ওপর ফুল-লতা-পাতায় সাজানো মাখাল বা ছাতা ধরে নিজের পায়ে ধানগুলি নাড়তে থাকে। এ-ছাতা ধরে যখন রাখে তখনই ছাতার ওপর পিঠা, নাড়ু, বাতাসা, পান-সুপুরি ফেলা হয়। তখন সবাই মিলে তা কুড়িয়ে খায় ও সমস্বরে গীত গাইতে শুরু করে।...প্রসূতি পূর্বোক্ত সেই 'লোরা'কে শিশুর মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। [বাহ্যত এটি নবজাতককে নিয়ে আনন্দ-উৎসব বটে, কিন্তু এর পেছনে আছে কয়েকটি জাদু-বিশ্বাস। সেদ্ধ করা ধান শুকুতে দেবার পর, গ্রাম্য রমণীরা সাধারণত তা পা দিয়ে নেড়ে দেয়—যেন শিশুর কৃষিকর্মের সাফল্যের কারণে গৃহরমণীগণ বা মা সেই ধান নেড়ে দিচ্ছে। ছাতা বা কোনো বস্ত্রের আবরণ থাকবেই, উপরন্তু ছাতা এখানে বর্ষা বা আকাশস্থিত কোনো দেবতা বা কৃষিকর্মের সহায়ক কোনো শক্তি। পুনশ্চ, ছাতার ওপর থেকে নাড়ু-বাতাসা পড়া শিশুর জননীর পরবর্তী একাধিক শিশুর আগমনের সূচক। এই ধরণের সব কটি অনুষ্ঠানেরই মূল লক্ষ্য—প্রসূতির পরবর্তী একাধিক সন্তান]। 'ভবিষ্যতে যাতে শিশুর কোন অমঙ্গল না হয়—এই উদ্দেশ্যেই শিশুর দেহের উপর দিয়ে এই 'লোরা'র বাতাস লাগানো হয় [হিন্দু আচার অনুসারে 'পাখা' ব্যবহৃত হয়। পাখার বাতাস শিশু বা জামাইয়ের অমঙ্গল দূর করবে, এই বিশ্বাস। বীরভূমে অরণ্যষষ্ঠী পূজার দিন জননীরা পাখার বাতাস দিয়ে বলে—'ষাটু'র অর্থাৎ ষষ্ঠীর 'বাও' [বাতাস ও পান] সেই 'লোরা'র ভেতরে কাঠকয়লা, সর্ষে ইত্যাদি ফেলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষে প্রসূতি জাতককে কোলে নিয়ে বাড়ির বিভিন্ন ঘরের দরজায় দাঁড়াবে প্রত্যেকটি ঘরে নিজে এবং

শিশুকে নিয়ে আপন ঘরে ফিরে আসে। প্রসূতি ঘরের দরজায় দাঁড়াবার সময় একটি পাত্রে পানি নিয়ে সে ঘরের চালায় ছিটিয়ে দেয়। পানি ছিটানোর পর ষাইট্যারা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে [ঘরে-ঘরে শিশুকে নিয়ে যাওয়া—স্পষ্টতই সমস্ত গৃহের সঙ্গে তার পরিচয় সাধন। কোনো কোনো অঞ্চলে নববধূ প্রথম শ্বশুরলয়ে এলে তাকেও সম্পূর্ণ ঘর-দোর দেখানো হয়। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বাড়ি-ঘর পবিত্র-বিশুদ্ধ করা—যেখানেই এবং যেভাবেই জল ছিটানোর অনুষ্ঠানটি থাকবে, সেখানেই অপরিহার্য নিয়মে তা একটি জাদুময় ভূমিকা নেবেই]।

এম. সাইদুর 'হাইট্যারা' 'সাইটোর'কে ভিন্ন দুই অনুষ্ঠান ভেবে ভুল করেছেন। ষাইটোর/সাইটোরই যে উচ্চারণ বিকৃতিতে 'হাইট্যারা' হয়েছে সামান্য আয়াসেই তিনি তা বুঝতে পারতেন—যদিও তিনি নিজেই লিখেছেন, কোথাও কোথাও শিশুর মুখে-ভাত অনুষ্ঠানেও 'সাইটোরের গীত' গাওয়া হয়। আসলে ষষ্ঠী শব্দ থেকেই 'ষাটাই'-এর উত্তর প্রত্যয় যোগ করে 'ষাইটোর' যদি হয়ে থাকে তবে 'ষাইটোর' তিন ভাবে, তিন অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয় : ক. জননীর বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবার জন্যে; খ. শিশুর জন্মের ছয়, সাত বা একুশ দিন পর; গ. শিশুর অন্নপ্রাশনের কালে। রংপুর জেলাতে জননীর বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবার জন্য যে 'সাইটোর' অনুষ্ঠানের কথা এম. সাইদুর উল্লিখিত গ্রন্থে বলেছেন [পৃ. ১৪-১৫] তাতে একদিকে জাদু অনুষ্ঠানের সূচক এবং অন্যদিকে বন্ধ্যানারীর করুণ আর্তিতে পূর্ণ। বর্ণনাটি এই রকম :

> 'একজন বন্ধ্যানারীর সন্তান লাভের আশায় গ্রামের অন্যান্য রমণীরা এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আলু, পটল, কলা, চিনি, গুড়, মুড়ি, খই ইত্যাদি সাজিয়ে একটি ঝুড়িতে কোথাও ঝোলানের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর বন্ধ্যা স্ত্রীলোকটি তার নিচে বসে পরিহিত শাড়ির আচল পেতে রাখে। তখন মেয়েরা সমবেত কণ্ঠে সাইটোরের গীত গায় আর সেই ঝুড়িটি ধরে নাড়তে থাকে। ঝুড়ি ক্রমাগত নাড়ার ফলে হঠাৎ তা থেকে যদি কোন দ্রব্য সেই বন্ধ্যা রমণীর আঁচলে এসে পড়ে তবে সে তার কিছু অংশ গিলে ফেলে এবং বাকিটা ঘরের মাচায় তুলে রাখে।'

এই অনুষ্ঠানে ফল-মিষ্টান্ন সন্তানের প্রতীক, পটল, শশা প্রভৃতি Phallic symbol, সর্বত্রই তা ওপর থেকে পতিত, 'ঝুড়ি' এখানে মাতৃজঠরের প্রতীক হতে পারে। ফল-মূল খেয়ে গর্ভসঞ্চার লোককথারও একটি পরিচিত Motif।

[রংপুর জেলায় বন্ধ্যা নারীকে, ভাষাতাত্ত্বিক নিয়ম 'বাঞ্জা' এবং স্বাভাবিক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকেও স্ত্রীলিঙ্গ বাচক করে 'বাঞ্জী' বলা হয়। আমার 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোক-সঙ্গীত' বইতে ষাইটোনের একটি পূর্ণ পালাগান উদ্ধৃত হয়েছে। নিঃসন্তান পুরুষকে সেখানে 'বাঞ্জা ন্যাড়ের ব্যাটা' বলে গালি দেওয়া হয়]। এম. সাইদুর যে গানটির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, ডিঙ্গায় চেপে এসে 'ষাইটোরী মাও' বন্ধ্যা নারীকে সন্তান-প্রাপ্তির বর দিয়ে গেলেন।

রংপুরের 'ষাইটোর গান' নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেছেন—তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রঙ্গপুরের পল্লী গীতিকায় রঙ্গরস' [অলকা : বৈশাখ, ১৩৪৭। পৃ. ৬৮৪-৬৯১] প্রবন্ধে। এটির বিশেষত্ব হল, এক পুত্র হবার পর পিতা যখন ষাইটোর পূজার আয়োজন করছে, তখন পরবর্তী সন্তানের জন্মদানের জন্য তার অক্ষমতার প্রশ্ন তুলে কৌতুক করা। [সন্তানের জন্মের পর পিতার ভূমিকা প্রসঙ্গে পরে আরো বলেছি]। তারাপ্রসন্ন লিখেছেন :

" 'ষাইটোর পূজা' নামে একটি ব্রত রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থলে ইহা ষষ্ঠীপূজা নামেই খ্যাত।... কলা এবং শোলার ফুল এই গানের প্রধান উপকরণ। শোলার গাছ রোপণ করিয়া তাহার চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেয়েরা কুলা হাতে করিয়া গান করিতে থাকে।" একটি গানে আছে :

আগা হাটের বামনা রে, পাছা হাটের[১] বামনা।
কলতি[২] পুছেছে[৩]—ও বামনা ঠাকুর রে—
কি করিমেন[৪] আগ্ বল হাটের কলা রে।।
তোর মাথা হইয়াছে পাকিয়া শন
কমর হইয়াছে ধনুক বাণ[৫]—
এখন কি তোমার সাজে ছাওয়ালের বাপরে।।

[১. হাটের প্রথম ও শেষ দিকের ক্রেতা রূপে জনৈক বাহ্মণ পুরুষ ২. যে কলা বেচে ৩. জিজ্ঞাসা করছে ৪. করবেন ৫. কোমর ধনুকের মতো বেঁকে গেছে।]

এই ধরনের অনুষ্টানের মধ্যে সর্বত্রই দেখা যায় : ক. পিতা ও মাতার অধিকতর সন্তানের জন্য কামনা খ. ওপর থেকে ফল-মূলাদি পড়া এবং একদিকে তা Phallic symbol, অপর দিকে তা আগুয়ান সন্তানের প্রতীক; গ. সকলের সমবেত ভাবে আনন্দ-রঙ্গ-কৌতুক করা। ষষ্ঠীপূজার কৃত্যাদিকে একদা সুন্দর

নাট্যরূপ দিয়েছিলেন নিরুপমা দেবী তাঁর 'অরণ্য ষষ্ঠী' [ভারতী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১] প্রবন্ধে। এই প্রসঙ্গে অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ষষ্ঠী ব্রতের কথা' [ভারতী। আশ্বিন, ১৩০৫। পৃ. ৫১৮-৫২২] দ্রষ্টব্য।

৪.

সন্তানের জন্মকালে বিভিন্ন আদিবাসী সমাজে পিতার ভূমিকা; শিষ্ট সমাজে এ বিষয়ে পিতার কোনো ভূমিকা নেই। 'ভারতী' পত্রিকার 'সম্পাদকের বৈঠক' [মাঘ, ১২৮৯। পৃ. ৪৯৮-৫০৩] বিভাগে একদা এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছিল। তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

'আবিপোন নামে দক্ষিণ আমেরিকায় এক জাতি বাস করে। তাহাদের কাহারও সন্তান হইলে পিতাকে মাদুর মুড়ি দিয়া ছেলে কোলে করিয়া এক কোণে পড়িয়া থাকিতে হয়। তাহার গায়ে যেন বাতাস না লাগে। তাহাকেই আঁতুড় ঘরে থাকিতে হয় ও উপবাস করিতে হয়।.....'

'ব্রেজিল দেশে কোরোডো নামে যে অসভ্যজাতি বাস করে, তাহাদের কাহারও স্ত্রী গর্ভবতী হইলে স্বামীকে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নির্জনে বাস করিতে হয়। সন্তান হইবার পূর্বে তাহাকে আহার সম্বন্ধে খুব সাবধান হইতে হয়, কোন প্রকার মাংস খাইতে তাহার অধিকার থাকে না।...'

'গায়নার উত্তরাংশে আকাই এবং কারিবী জাতি বাস করে। তাহাদের কাহারও সন্তান হইলে পিতাকে কাপড় মুড়ি দিয়া শিশু কোলে করিয়া শুইয়া থাকিতে হয়।...উত্তর আমেরিকার সোশোনে জাতির মধ্যে গর্ভিণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে স্বামীকেও দ্বার রুদ্ধ করিয়া একাকী বসিয়া থাকিতে হয়।...'

'গ্রীণলণ্ডে কাহারও সন্তান হইলে পিতাকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত সকল প্রকার কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া বসিয়া থকিতে হয়।'

'কামস্কাটকায় কাহারও সন্তান হইবার সম্ভাবনা হইলে প্রসবের কয়েকদিন পূর্ব হইতে স্বামীকে কঠিন পরিশ্রমের সকল প্রকার কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়।...'

'আমেরিকার কারিব জাতিদিগের কাহারও সন্তান হইলে স্ত্রী প্রসবের পরেই গৃহকার্যে প্রবৃত্ত হয়। স্বামী শিশু লইয়া পালন করিতে থাকে। তাহাকেই উপবাস দিতে ও পাচন ও ঝাল মশলা খাইতে হয়। এইরূপে চল্লিশ দিন তাহাকে প্রসবগৃহে বাস করিতে হয়। তাহার পর নিমন্ত্রিত বন্ধু-বান্ধব আসিয়া তাহাকে প্রহার করিতে

আরম্ভ করে। প্রহারে তাহার সর্বশরীর ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইলে গোল মরিচের গুঁড়া জলে মিশাইয়া তাহার সর্বশরীর ধুইয়া আবার তাহাকে বিছানায় শুয়াইয়া দেয়। সেখানে আরও দশ-পনর দিন তাহাকে কাটাইতে হয়। শিশুর দশ মাস বয়স পর্যন্ত কোন প্রকার মৎস্য, কি পক্ষিমাংস তাহার পক্ষে নিষেধ। প্রহারের সময় অভাগা কাঁদিলে বা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলে শিশুর অমঙ্গল হয়।...'

'বের্ণিওর ডায়াকদের মধ্যে কাহারও সন্তান হইলে পিতা ধারাল অস্ত্র কি বন্দুক ব্যবহার করিতে পারেন না। সন্তান হইবার পর পিতাকে কয়েকদিন নির্জন বাস করিতে হয় এবং কেবল ভাত ও লবণ খাইয়া থাকিতে হয়। পিতার আহার গুরুতর হইলে শিশুর পেট ফাঁপিতে পারে, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস।'

'কালি ফোর্ণিয়ার ইন্ডিয়ান, পশ্চিম আফরিকার জুকেলি ও চীন দেশের মিয়াঞ্জি জাতির মধ্যে এবং পূর্বোপদ্বীপের বোরো দেশে শিশু হইলে স্বামীকেই ঔষধ ও পথ্য খাইতে হয়। কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণ তীরবর্তী তিবারেণী জাতির মধ্যেও স্ত্রী প্রসব করিলে স্বামী বিছানায় পড়িয়া গোঁয়াইতে থাকে, স্ত্রী-স্বামীর সেবা করে ও তাহাকে পথ্য দেয়।...'

'আমাদের দেশেও মান্দ্রাজ শ্রীরঙ্গপত্তন এবং মলয় উপকূলে কোন কোন জাতির মধ্যে কাহারও সন্তান হইলে পিতাকে এক চন্দ্রমাস কাল শুধু ভাত খাইয়া থাকিতে হয়। কোন গুরুপাক দ্রব্য আহার কি তামাক সেবন তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ।...'

এই প্রকার বিস্তৃত তথ্য প্রদানের পর প্রবন্ধের শেষে 'পাদটীকা' ছিল : 'কোন কোন জাতির মধ্যে স্বামী পাখি পুষিলে স্ত্রীকে মাছ মাংস মসলা পরিত্যাগ করিতে হয়। নতুবা পাখির পেটের পীড়া হইতে পারে। যদি কোন কারণে পাখি মরিয়া যায়, স্ত্রীকে প্রহার সহ্য করিতে হয়, কারণ তাহারই আহার-দোষে যে পাখি মরিয়াছে, তাহার সন্দেহ কি?'—পৃ. ৫০০। এই প্রসঙ্গে ধনেশ পাখির [the Horn Bill] জীবনের কথাও উল্লেখযোগ্য। স্ত্রী ধনেশের সন্তান বা ডিম প্রসবের কাল এগিয়ে আসতেই, যে বৃক্ষ কোটরে তার প্রসব হবে, সেই কোটর পুরুষ ধনেশ সম্পূর্ণ কাদা-মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেয়, স্ত্রী ধনেশ কেবল গলাটুকু বাড়িয়ে রাখে। পুরুষ ধনেশই তার খাদ্য জোগায়। এই খাদ্য জোগাতে গিয়ে অনেক সময় পুরুষ ধনেশ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে, কখনো বা তার মৃত্যুই হয়। এ বিষয়ে আমার 'বিহঙ্গচারণা' বইটিতে প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া যাবে।

ওপরে সন্তানের জন্মকালে এবং তার অব্যবহিত পরে পিতার ভূমিকা সম্পর্কে যে সব তথ্যাদি সঙ্কলিত হল, তার বিস্তৃতি এবং ব্যাপকতা বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ-নিছক এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত মাত্র নয়, এর পেছনে আদিম মানুষের কয়েকটি বিশ্বাস কাজ করেছে। আমাদের মতে, এই বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত দিক এই : সমগ্র প্রসঙ্গটির মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট বিভাগ আছে। মনে হয়, কালের প্রভাবে, পরবর্তী স্তর রূপে দ্বিতীয় বিভাগটির উদ্ভব হয়েছে। প্রথম বিভাগ বা স্তরটি হল, স্ত্রীর প্রসব যন্ত্রণার অনুকরণে স্বামীর নিজের যন্ত্রণা ভোগের অভিনয়। আর দ্বিতীয় স্তরটি হল, প্রসবের পর স্বামীকেই সন্তান লালনের ভূমিকা গ্রহণ। এটিই পরবর্তীকালীন স্তর—প্রথম স্তরটির প্রসারণে।

প্রথম স্তরটিকে স্ত্রীর প্রসব যন্ত্রণার অনুকৃতিমূলক অভিনয় বলেছি। এই অনুকৃতিমূলক অভিনয় আসলে একটি Alleviative method অর্থাৎ অপরের যন্ত্রণা-বেদনার অনুকৃতিমূলক অভিনয় দ্বারা তার যন্ত্রণা-বেদনার উপশম বা অপনোদন করা। স্বামী এখানে Alleviator অর্থাৎ উপশমকারী। এ-এক ধরনের লোকমনস্তত্ত্বজাত লোকচিকিৎসা। এখানে Christ lore বা 'খ্রীস্টচারণা'র একটি দিক তুলনীয়। এই lore অনুসারে, যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যে যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন তা সকল মানবজাতির হয়ে যন্ত্রণা-বেদনা সহ্য করা, একে তাই বলা হয়—যিশুর 'Vicarious suffering'। স্বামীও এখানে স্ত্রীর জন্য 'Vicarious suffering' ভোগ করে। স্বামীর এই যন্ত্রণা-ভোগের অভিনয় যিশুর যন্ত্রণাভোগেরও পূর্ববর্তী স্তরের একটি প্রথা বলে মনে হয়। তবে পারিবারিক জীবন খুব integrated বা 'সংহত' না হয়ে ওঠা পর্যন্ত এ-ধরণের প্রথার সৃষ্টিও হতে পারে না।

দ্বিতীয় স্তরটি অর্থাৎ স্বামীই যেখানে সন্তান লালনকারী—তা কোনো মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব হতে পারে। এখনও অনেক মাতৃতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রীরাই মাঠে কৃষিকর্ম এবং হাটে-বাজারে কেনা-বেচা করতে যায়—স্বামীরা তখন শিশুদের দেখা-শোনা করে। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদাকে মণিপুরের রাজা পুরুষসন্তান রূপে পালন করেছিলেন এবং সেই কারণে চিত্রাঙ্গদাকে শিকারীর বেশে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। আসল কারণ—মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রথা। মনে রাখতে হবে, অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করবার পর পুত্র বভ্রুবাহনের জন্ম পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন,—যা মাতৃতান্ত্রিক সমাজেরই প্রথা। এ-বিষয়ে আমার সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা : কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য' বইটিতে আরো তথ্য পাওয়া যাবে।

সবার শেষে, লোকনাট্যের উদ্ভবের প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখযোগ্য। গবেষকদের অনুমান Dramatic ritual > Ritual drama; অর্থাৎ যে সব আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে নাটকীয়তা আছে, সেইগুলিই কালের বিবর্তনে 'আনুষ্ঠানিক নাট্যে'র উদ্ভব ঘটিয়েছে। পরে তার নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকাশ ঘটেছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে যেমন স্বামীর অনুকৃতিমূলক অভিনয়, ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে তেমন অনুকৃতিমূলক অভিনয় আছে : 'সতীন কেটে আলতা পরি', এখানে যেন সত্যি সত্যি সতীনকে কেটে তার রক্ত রূপে আলতা পরা হয়। তেমনি অনেক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকে সংলাপ ও মূকাভিনয়ের দিক। অনেক সময় পিতা শিকারী বা যোদ্ধা হলে সন্তানের জন্মকালে সেই ধারার অনুকরণ করা হয়। যেমন, অভিজাত কুকিদের ঘরে সন্তান জন্মালে বাড়িতে রণবাদ্য বাজানো হয় [অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখিত 'কুকি' প্রবন্ধ। ভা. তী : মাঘ, ১৩২৪]।

৫.

নবজাতকের নামকরণ সম্পর্কে নানা প্রকার নিয়ম-সংস্কৃতির কথা শোনা যায়। লোকসমাজ ও আদিবাসী সমাজেই এ নিয়ে নিয়ম-সংস্কৃতির নানা বিশেষত্ব দেখা যায় বটে, তবে শিষ্টসমাজেও নানা কৌলিক-পারিবারিক প্রথার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে পুরুষের নামকরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় মূল নাম, তারপর ইন্দ্র/এন্দ্র, মধ্যে 'নাথ' তারপর পদবী বসে। কৌলিক নামের এই প্রকার মিল অন্যান্য বহু পরিবারেও আছে। পিঠোপিঠি দুই ভাই, দুই বোন, এক ভাই এক বোন—এ-সব ক্ষেত্রে সাধারণত জোড়া মিলিয়ে নামকরণ হয়ে থাকে। গঙ্গা-যমুনা, লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ, রাম-লক্ষ্মণ, লব-কুশ প্রভৃতি এ-সবের প্রচলিত উদাহরণ। দিন-ক্ষণ-ঋতু-বর্ষ প্রভৃতি ছাড়াও সপ্তাহের বার অনুযায়ী নামকরণ এক সাধারণ ব্যাপার। হরিহর শেঠ, সেকালের এক ঐতিহাসিক, একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'শিশুদের নামকরণ প্রথা' [প্রবাসী : অগ্রহায়ণ, ১৩২৯। পৃ. ১৯৩-১৯৭]। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক ভবতারণ দত্ত নামকরণ তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন।

আমার মতে, শিশুর আদরার্থক নামকরণ [Endearment], অপমানকর নামে ডাকা [to call one bad name] একই নামধারীর মধ্যে [name-sake] একজনকে চিহ্নিত করা [যেমন, একই অঞ্চলে দুটি মেয়েরই নাম-লক্ষ্মী। একজনের গালে

একটু কাটা দাগ আছে, তার নাম হয়ে গেল—'গালকাটা লক্ষ্মী']। এ ছাড়া মূল নামের সঙ্কোচন, প্রসারণ এবং বিকৃতিও আছে। 'ডাকনাম'-এর পর 'দেওয়া' ইডিয়াম রূপে যুক্ত হয়।

বাঙালি শিশুর নামকরণের মধ্যে আজ নানা পরিবর্তন এসেছে। যেমন ইংরেজি নাম পাই : ডাল, ববি। পম্পি, এমা। রূপকথায় ও মধ্যযুগীয় জীবন ও সাহিত্যে যে নামকরণ মেলে, আজ স্বাভাবিক কারণেই তা মিলবে না। রূপকথার নায়ক-নামের মধ্যে, মধ্যবর্তী অংশ ছিল কুমার [ডালিমকুমার, কাঞ্চনকুমার], নায়িকার নামের উত্তরাংশে থাকত [রাণী-কমলারাণী; বতী-রূপবতী; মালা-কিরণমালা, শঙ্খমালা, লতা-কাজললতা] বিশেষ কয়েকটি দিক। মধ্যযুগীয় জীবন ও সাহিত্যে যে নামকরণ মেলে তা একদিকে ঐশ্বর্যদ্যোতক অপর দিকে রাজা ও বণিকের আসঙ্গযুক্ত। ঐশ্বর্যবাচক নামের সঙ্গে প্রায়ই 'ঈশ্বর' [লক্ষেশ্বর, সুরেশ্বর, ধনশ্বের], 'ইন্দ্র' [বলীন্দ্র, লক্ষ্মীন্দ্র] যুক্ত হত। কোনো কোনো নাম ছিল সুভাষণমূলক [কিন্তু বহুক্ষেত্রেই তা ব্যঙ্গমূলক হয়ে পড়ত, ফলে প্রবাদের সৃষ্টি হয় 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন'], সর্বপ্রকার যুক্তব্যঞ্জনবিহীন নামের শিশু যদি পড়াশোনাতে খাটো হত, ব্যঙ্গ করে বলা হত, পিতামাতার অদূরদর্শিতার নিদর্শন [যেমন, শশধর কর, নয়ন ধর]। সমাসবদ্ধ পদকে নামরূপে ব্যবহার একদা খুব চলিত ছিল : রামকৃষ্ণ [যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ], রাধাকৃষ্ণ [রাধা ও কৃষ্ণ], শিবকালী প্রভৃতি। সমাসের মধ্যে প্রাধান্য পেত কর্মধারয়, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্বসমাস। [দেব দেবীর নামের উত্তর অবধারিত নিয়মে, মধ্যাংশ রূপে থাকত 'পদ', চরণ। [দেবীপদ, দুর্গাচরণ]। এসব ক্ষেত্রে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস মুখ্য স্থান নিত [দেবীর পদ, দুর্গার চরণ]। দেবদেবীর 'প্রসাদ' [হরপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ], 'আশিস' [দেবাশিস, শিবাশিস] প্রভৃতিও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'চন্দ্র' ও 'কুমার' সারা ভারতেই মধ্য নাম রূপে সমাদৃত। নারীর নামের ক্ষেত্রে সরাসরি দেবীদের নাম গৃহীত হয়। একই 'রাধা' দিয়ে নানাবিধ সমাস তৈরি হত : রাধা-মাধব [রাধা ও মাধব, দ্বন্দ্ব সমাস], কিন্তু রাধাবিনোদ [রাধার বিনোদকারী যিনি, বহুব্রীহি]।

ডাক নামের [Cogno men / Nick name] ক্ষেত্রে মূলত আদরার্থক, সুখশ্রুতিমূলক অর্থহীন ধ্বনি, মূল পোষাকী নামের প্রত্যায়ন্ত সঙ্কোচন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই রকম একটি নাম—'উপাতন' [< অরূপরতন]। তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'য় 'শ্রীহরি' হয়ে গেছে 'ছিরু'। তেমনি 'কবি'র 'বসন্তবালা' হয়েছে

'বসন'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বঙ্গীয় মুসলমান শিশুর নামকরণে বাঙলা সন্ধি খুব অনুসৃত হয়। যেমন, মজহার-উল > মজহারুল। জমিরউদ্‌দীন > জমিরুদ্দীন। সাম্প্রতিক বাঙলাদেশী মুসলমান শিশুর ডাক নামের ক্ষেত্রে তৎসম-তদ্ভব শব্দের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ পোষাকী আরবি নামের উত্তর একটি বাড়তি তৎসম-তদ্ভব শব্দ জুড়ে দিচ্ছে। সমাজতাত্ত্বিকগণ এর মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার এক নতুন দিক খুঁজে পেতে পারেন।

নিখিল বঙ্গেই পুত্র-কন্যা 'খোকা-খুকু' নামে পরিচিত, পূর্ব বঙ্গের 'পোলা' [তামিল 'পিল্লৈ' থেকে আগত বলে ড. সুকুমার সেন মনে করেন], পশ্চিমবঙ্গে মানবেতর প্রাণীতে পরিণত [যেমন, মাছের 'পোনা' এবং সেই মাছ, বড়ো হলেও 'পোনা'ই থেকে যায়। যথা, 'কাটা পোনা'।] পশ্চিমবঙ্গের 'পোনা' উত্তরবঙ্গের পাবনা-রাজশাহীতে 'নওলা' [< নব + ল, লা। তুলনীয় : 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত—'নওলকিশোর' এবং শেষে 'নোলা', 'ন'লা']। 'খোকা' থেকে 'খোকন' [পূর্ববঙ্গে 'কোকন'], 'খোকনমণি', 'খোকনসোনা', [মণি' ও 'সোনা' উত্তর পদ রূপে সংযুক্ত] : 'ছেলে ভুলানো ছড়া-১'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'খুকুন' এবং 'খোকোমণি' ['আমার কোলে ঘুম যায় খোকোমণি']। অপরিচিত ও অজ্ঞাত পরিচয় যে কোনো পুরুষ শিশুকেই পূর্ববঙ্গে সাধারণভাবে 'মনা', 'বাঁশি' [মূলত বংশীধর, বংশীবদন নামের সাংক্ষিপ্তায়ণ] ইত্যাদি নামে ডাকা হয়, আদরার্থে। কিন্তু 'বংশগোপাল' বা 'বংশলোচন' নামের মধ্যে বাঁশির প্রভাব নেই।

শিশুর নামকরণের মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার দিক হল—নারীর [বিশেষত মৃতবৎসা নারীর, বহুসন্তানবতী নারীর] মনস্তত্ত্ব ও নারীর ভাষার দিক। সন্তান যেন মায়ের নিজের নয়, অতএব পরবর্তী সন্তানকে যম আর টেনে নেবেন না, সন্তানকে মা যেন 'কুড়িয়ে' পেয়েছে। এর থেকে 'কুড়ানু' [তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকের কুড়ানু বৈরাগী'], 'কুড়ানী' [রবীন্দ্রনাথের 'মাল্যদান' গল্পে], 'বুড়ুনে' [< কুড়ান + ইয়া] প্রভৃতি নাম মেলে। তেমনি সন্তানকে অধিক আদর করলে তা যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, এই ভয়ে 'হেলা' [হেলারাম'। স্ত্রীলিঙ্গে 'হেলী'], 'ফেলা' [যাকে ফেলে দেওয়া হল, 'ফেলারাম' এবং অতঃপর 'পেলারাম'। স্ত্রীলিঙ্গে 'ফেলী']। কুড়ানো বা পরিত্যক্ত শিশুর দৈহিক লক্ষণাদির ওপর রাজমহিমা আরোপ করা হয় [যেমন, 'মুক্তধারা'র অভিজিৎকে ঝর্ণাতলায়

পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল]। অব্যবহিত পূর্ববর্তী সন্তানের মৃত্যুর পর জাত সন্তানকে মা যেন পুনরায় ফিরে পান। নাম হয়—'হারাধন', 'হারাণচন্দ্র', বা কেবলই 'হারাণ'। স্ত্রীলিঙ্গে 'হারাণী'।

৬.

শিশুবলি, শিশু-উৎসর্গ : শিশুর সজীবতার এবং পরবর্তী সম্ভাবনার মধ্যে সপ্রাণতা এবং তার অকলঙ্ক নিষ্পাপ জীবনের মধ্যে এক বিশেষ দেবমহিমা আরোপিত হয় বলেই, নানা বিশেষ অনুষ্ঠানে শিশুবলি বা শিশু উৎসর্গ করবার প্রথা বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বের বহুস্থানে প্রচলিত আছে। এ জন্যে শিশু ক্রয়-বিক্রয়ের নিষ্ঠুর প্রথাও এককালে প্রচলিত ছিল। কখনো শিশুকে ধন-সম্পত্তির রক্ষক রূপে 'যক্ষ' করে রাখা হত [যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পে]। এ-বিষয়ে কিছু কিছু গবেষণাদিও হয়েছে। যেমন, 'প্রাচীন ভারতে সমৃদ্ধিচিন্তা ও নরবলি প্রথা [সারস্বত: শ্রাবণ-আশ্বিন : ১৩৷১৭। পৃ. ১০৪-১১৪]। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের 'উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি' [সেপ্টেম্বর, ১৯১১] বইয়ের অন্তর্গত প্রবন্ধ 'শতবর্ষ পূর্বে বাংলা দেশে নরবলি' [পৃ. ৮৫-৯২), প্রভৃতি। দুর্গাপূজার অষ্টমী তিথিতে যেমন 'গৌরীপুজা', ঠিক তারই বিপরীতে 'শিশুবলি'।

অতি প্রাচীনকাল থেকে, সমগ্র বিশ্বে 'আত্মা' [the Soul] সম্পর্কে মানুষের কতকগুলি বিচিত্র বিশ্বাস ছিল। যেমন, 'আত্মা' একটি tangible বা স্পর্শযোগ্য বস্তু; তা এক দেহ বা বস্তু থেকে অন্য দেহ বা বস্তুতে transfer বা সঞ্চারিত করা যায়। এই দ্বিতীয় বোধটাই শিশুবলির [এবং নরবলির] ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়েছে। শিশুর প্রাণ বা তার 'আত্মা' কোনো যন্ত্রে, বস্তুতে বা অন্য কোনো পদার্থে সঞ্চারিত হয়ে তাকে সক্ষম, সক্রিয় এবং সঞ্জীবিত রাখবে, এই বিশ্বাসের ফলেই এটি করা হয়। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৪, রবিবার, আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই তিন কলম জুড়ে একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল : 'ইটভাটার আগুন ঠিক মতো জ্বালাতে তান্ত্রিকের নির্দেশে শিশুবলি বিহারে'। সংবাদটি এই দিনের The Telegraph পত্রিকাতেও ছাপা হয়। সংবাদটির প্রাসঙ্গিক অংশ এই :

'ইটভাটার আগুন ঠিকমতো জ্বালাতে এক তান্ত্রিকের নির্দেশে [তান্ত্রিকের নাম—রামাশিস চৌহান; তার সহকারী—মহেশ্বর ভুঁইয়া] পাঁচ বছরের একটি শিশুকে [শিশুটির নাম—বিকাশ, বাবার নাম—ডোমন মাহাত] বলি দেওয়া হয়েছে। বলি

দেবার আগে শিশুটির মাথার চুল কামিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে নাক, কান জিভ এবং আঙুল। উপড়ে ফেলা হয়েছে তার চোখও। বিহারের ঔরঙ্গবাদ জেলায় গত পূর্ণিমার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে।... নাক, কান, জিভ এবং আঙুল কেটে তা পুজোয় লাগানো হয়। পরে তার ছিন্ন ভিন্ন দেহটি গ্রামের পাশের আদ্রি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।...এর পরে গ্রামের মানুষ ওই তান্ত্রিককে ধরে বেদম প্রহার করে।...গ্রামের সব শিশুকে ডেকে তান্ত্রিক স্থানীয় ফিরিওয়ালার কাছ থেকে জিলিপি কিনে খাওয়ায়।... ওই সময় বিকাশকে বারবার দেখছিলেন ওই তান্ত্রিক। তার শরীরের বিভিন্ন 'লক্ষণ' নিয়েও নিজের সাগরেদদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন রামাশিস।...প্রচলিত বলির মতো শিশুটির গলা ধড় থেকে পৃথক করা হয় নি। পুজোয় বসে ধারালো অস্ত্র দিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে তাকে মারা হয়েছে।...'*

'শিশুবলি' এবং 'শিশু উৎসর্গে'র মধ্যে পার্থক্য আছে। আলোচ্য দৃষ্টান্তটি 'শিশু উৎসর্গে'র। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পৃথক পৃথক function আছে বলে বিশ্বাস করা হয়।।